স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকী
১ম বর্ষ ❑ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ❑ আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০১২

সম্পাদক
ডা. পুণ্যব্রত গুণ

কার্যনির্বাহী সম্পাদক
ডা. জয়ন্ত দাস

সহযোগী সম্পাদক
ডা. পার্থপ্রতিম পাল ❑ ডা. সুমিত দাশ

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা
ডা. অভিজিৎ পাল ❑ ডা. অমিতাভ চক্রবর্তী
ডা. অনুপ সাধু ❑ ডা. আশীষ কুমার কুন্ডু
ডা. চঞ্চলা সমাজদার ❑ ডা. দেবাশিস চক্রবর্তী
ডা. শর্মিষ্ঠা দাস ❑ ডা. শর্মিষ্ঠা রায়
ডা. তাপস মণ্ডল ❑ ডা. সোহম সরকার

বিন্যাস ও অঙ্গসজ্জা ❑ স্নেহাশিস পাত্র

প্রচ্ছদ ❑ দেবাশিস পাত্র ও মনোজ দে
প্রচ্ছদচিত্র ❑ সিজার মিশ্র ও শম্ভুনাথ কর্মকার

বিনিময় ২০ টাকা

প্রকাশক
স্বাস্থ্যের বৃত্ত
ফ্ল্যাট : এফ-৩, ৫০/এ কলেজ রোড
হাওড়া-৭১১১০৩

মুদ্রক
এস এস প্রিন্ট, ৮ নরসিংহ লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয়

চিঠিপত্র ৫৯

শরীর
লো প্রেসার ❑ ডা. পার্থপ্রতিম পাল ৩
পুরুষের অস্টিয়োপোরোসিস ❑ডা. অনিরুদ্ধ কীর্তনিয়া ৫
সার্জিকাল জন্ডিস ❑ ডা. অর্কজ্যোতি মুখার্জী ও ডা. সুজয় বালা ৭
গর্ভাবস্থায় রক্তাল্পতা ❑ ডা. অনিরুদ্ধ কর ৩১
হারপিস জোস্টার ❑ ডা. শর্মিষ্ঠা দাস ২৮

শরীর ও বিজ্ঞান
শিশুর খাবার বিচার ❑ ডা. অলোক হালদার ৯
মাতৃদুগ্ধ নিয়ে দু-চার কথা ❑ ডা. নীনা ঘোষ ১৩
সাক্ষ্য-প্রমাণ নির্ভর প্র্যাকটিস ❑ ডা. তাপস মন্ডল ও চেতন গোহাল ১৬
মধুমেহতা ❑ডা. সিদ্ধার্থ গুপ্ত ১৯
স্বাস্থ্য খাতে খরচ ❑ ডা. অসীম চ্যাটার্জি ৩৫

শরীর ও সমাজ
স্বাস্থ্যব্যবস্থার স্বাস্থোদ্ধার হবে কি আমিরের পথে? ❑ ডা. পুণ্যব্রত গুণ ২৪
ভারতীয় স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও 'আমিরি' বিপ্লব ❑ ডা. প্রতীক দেব ৩২
সরকারি ও বেসরকারি চিকিৎসা পরিষেবা— আমাদের জন্যে ❑ ডা. দেবীপ্রসন্ন ঘোষাল ৩৮
এক গাঁয়ের ডাক্তারের গল্প ❑ ডা. অনিরুদ্ধ সেনগুপ্ত ৪০
জল যেখানে মৃত্যুর কারণ ❑ ডা. পি কে দাস ৪৮

মন ও শরীর
বিশ্বভরা প্রাণ ❑ডা. আশীষ কুমার কুন্ডু ৪৪
স্কুবি ডুবি ডু ❑অভিরূপ চ্যাটার্জী ৪৪
শিশুর মানসিক সমস্যা— কারা সমাধান করবে? ❑ প্রিয়াঙ্কা ভট্টাচার্য ৪৬

ডাক্তারের ডেস্ক ৩১

স্মরণে
ডা. বিজয় কুমার বসু ❑ ডা. রমেন্দ্রনাথ পাল ৫০

গল্প
অনাগরিক ❑ ডা. সাত্যকি হালদার ৫২

চলচ্চিত্রে ডাক্তার
ভিকি ডোনার ❑অংশুমান ভৌমিক ৫৪

বই পড়া
কাবুলের পথে পথে ❑দিলীপ ব্যানার্জী ৫৭

কুইজ ২৩
অভিষেক দাস

সম্পাদকীয়

যারা কেড়ে খায়

একেবারে ছোট শিশুর জন্য যে মায়ের দুধই সেরা খাদ্য সে-ব্যাপারে কোনো চিকিৎসকের কোনো সন্দেহ নেই। শুধু সেরা খাদ্যই নয়, ছয়মাস বয়স পর্যন্ত মায়ের দুধই শিশুর একমাত্র খাদ্য। তবু কিভাবে যেন বাচ্চার মুখে বোতলের দুধ উঠে আসে। কে বা কারা নাজেহাল নতুন মা-কে ভারি ভালোবেসে সৎপরামর্শ দেন, 'খালি তোমার দুধে কি বাচ্চার পেট ভরবে, দেখছ না বাছা কেঁদে কেঁদে ককিয়ে গেল?' কিংকর্তব্যবিমূঢ় মা হাতে বোতল ধরেন, বাচ্চার সেটাতে অভ্যাস হয়ে যায়। বোতল টানা আর মায়ের স্তনের দুধ টানার কায়দায় সামান্য তফাৎ থাকায় তারপর বাচ্চা আর চট করে মা'র দুধ টানতে চায় না। মায়ের দুধের ব্যাপারটা এমন যে শিশু না টানলে দুধ সত্যিই কমেও যায়। হিতাকাঙ্ক্ষীরা বলেন, 'দেখলে তো!'

হিতাকাঙ্ক্ষী অবশ্য সর্বত্র। সরকার আইন করে 'ফর্মূলা ফুড'-এর বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করেছেন, অর্থাৎ বেবিফুডের বিজ্ঞাপন সরাসরি প্রচার করা যায় না। কিন্তু বেবিফুড কোম্পানিগুলো স্বাস্থ্যকর্মী থেকে হাসপাতালে প্রসব হতে আসা মা—এঁদের হাতে বিনামূল্যে স্যাম্পল বিতরণ করছে, আরও নানা ভাবে তাঁদের প্রভাবিত করছে। অনেকে অবশ্য মনে করেন তাঁরা নিজের বুদ্ধিতে বেবিফুড খাওয়াচ্ছেন, কোম্পানির প্রচারে না ভোলার মতো বুদ্ধি তাঁদের আছে। কিন্তু সুকৌশলী বিজ্ঞাপনের ক্ষমতা অসীম—তা প্রত্যেকের অবচেতনে ও পারিপার্শ্বিকে প্রভাব বিস্তার করে। বেবিফুড কোম্পানিগুলো শিশুদের ব্যবহারযোগ্য অন্যান্য নানা জিনিসপত্র তৈরি করে তা বাজারে বিক্রি করছে, বিজ্ঞাপন করছে—সাধারণের পক্ষে বোঝা মুশকিল যে বেবিফুড বিজ্ঞাপন করা যায় না, বা তা অন্য জিনিসগুলোর মতো নিজে কিনে খাওয়ানোর মতো জিনিস নয়। মায়ের দুধের বদলে বেবিফুড দিলে কোম্পানির ঘরে কোটি কোটি টাকা আসে বটে, কিন্তু শিশু মরে অপুষ্টিতে, রোগে ভুগে; আর মা ও পরিবারের অন্যদের স্বাস্থ্য ও সম্পদ দু-ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আর একটা জিনিস হল হেলথ ড্রিঙ্ক। কেউ ক্যালসিয়াম, কেউ আয়রন, কেউ বা ক্যালোরির হিড়িক তুলে, নতুন নতুন অবোধ্য আধা-মেডিকেল শব্দে আপনাকে বিজ্ঞাপনে বধ করে। বাচ্চাকে লম্বায় আর বুদ্ধিতে তাড়াতাড়ি বাড়ানোর জন্য ওইসব কাঁচের জার কি প্লাস্টিক বোতলে ভরা 'স্বাস্থ্যবর্ধক পানীয়' আপনি কিনে আনেন। হ্যাঁ, তাতে স্বাস্থ্য বাড়ে বটে, কিন্তু সেটা কোম্পানির স্বাস্থ্য। ওই পয়সায় আপনি ঢের বেশি পুষ্টিকর খাবার সবজির বাজার, মাছ-মাংসের বাজার বা মুদির দোকান থেকে কিনে বাচ্চাকে খাওয়াতে পারতেন। কিন্তু কুলেখাড়া শাক বা পেয়ারা কি মৌরলা মাছের তো কোনো বহুজাতিক উৎপাদক সংস্থা নেই, সুতরাং সেসবের জন্য কেউ বিজ্ঞাপন করে না। আর হর..., কম..., পিডি... ইত্যাদি হরেকরকমবা মুনাফা-বর্ধক পানীয়ের প্রচারের জন্য টিভি-রেডিও-সংবাদপত্র আছে, আছেন খেলার জগতের, সিনেমার জগতের আইডলেরা। এবং দুঃখের হলেও সত্যি, আছেন একদল ডাক্তার যাঁরা চিকিৎসা-বিজ্ঞান হয় জানেন না, নয় ছোটোখাটো দু-একটা উপঢৌকনের লোভে সেসব সাময়িকভাবে বেশ ভুলে যান। অবশ্য তাঁরাই ডাক্তার সমাজের একমাত্র প্রতিভূ নন এই যা সান্ত্বনা।

সুতরাং সতর্ক থাকুন, গাঁটের পয়সা খরচা করে আপনি আপনার শিশুর ক্ষতি করবেন না।

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত লেখা সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞান, বিশেষত চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্পর্কে ধারণা পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে লেখা। এই পত্রিকায় প্রকাশিত লেখার ভিত্তিতে কোনো পাঠক নিজের বা অন্যের চিকিৎসা করার চেষ্টা করবেন না। সে চেষ্টা করলে ফলাফলের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবেই সংশ্লিষ্ট পাঠকের, পত্রিকার নয়।

লো প্রেসার বা নিম্ন রক্তচাপ

চিকিৎসকের কাছে সমস্যাটা তত বড় মনে না হলেও রোগীর কাছে এব্যাপারটা খুব বড় মুশকিল। লো প্রেসার বা নিম্ন রক্তচাপ মানুষের কাছে নন্দ ঘোষের মত অমর্যাদা পায়— যেন যত নষ্টের গোড়া। আসলে এ রোগ নির্বিষ সাপের মত— কামড়ে অন্তত মৃত্যুভয় নেই। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন **ডা. পার্থপ্রতিম পাল**।

কমজোরি মনে হচ্ছে? মাথা টলে যাচ্ছে? চোখের সামনে হঠাৎ অন্ধকার দেখছেন? লো প্রেসার নয় তো? ডাক্তারবাবুকে একবার দেখিয়ে নেওয়া দরকার— এ হল যাবতীয় হিতাকাঙ্ক্ষীর সাধারণ উপদেশ, একটু খতিয়ে দেখা যাক।

রক্তচাপ কত হলে নিম্ন রক্তচাপ বা হাইপোটেনশন বলা যাবে? সবাই মনে করেন ১২০/৮০-র কম হলেই বেশি মাছ-মাংস ইত্যাদি প্রোটিন আর ভিটামিন খেয়ে রক্তচাপ বাড়িয়ে নিতে হবে। এটা ঠিক নয়। যে রক্তচাপে স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে অসুবিধা হচ্ছে না, প্রচলিত ধারণায় সেটা কম রক্তচাপ বলে মনে হলেও তা নিয়ে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। এমনকি ৯০/৬০ রক্তচাপ নিয়ে কেউ স্বাভাবিক কাজকর্ম চালিয়ে যেতে পারলে তাঁকে নিম্ন রক্তচাপের রোগী বলা যাবে না এবং তাঁর চিকিৎসার কোনো প্রয়োজন নেই। আরও একটা কথা জেনে রাখা দরকার যে মাছ-মাংস ইত্যাদি ভালোমন্দ খাবার এবং ভিটামিনের সঙ্গে রক্তচাপের কোনো সম্পর্ক নেই।

যদি রক্তচাপ কম থাকে এবং সঙ্গে অন্য অসুবিধা যেমন মাথা ঘোরা, মাথা টলে যাওয়া, চোখের সামনে অন্ধকার দেখা ইত্যাদি থাকে— তখন কম রক্তচাপের কারণ খুঁজে তার চিকিৎসা করা প্রয়োজন।

নিম্ন রক্তচাপ দু রকম হতে পারে

আকস্মিক বিভিন্ন কারণে রক্তচাপ কমে যেতে পারে। যেমন বারবার পাতলা পায়খানা হলে বা হার্ট অ্যাটাক হলে। এসব ক্ষেত্রে যে রোগের জন্য রক্তচাপ কমে গেছে তার চিকিৎসা করতে হবে।

তাৎক্ষণিক কোনো কারণ ছাড়াই দীর্ঘকাল ধরে নিম্ন রক্তচাপ চলছে—সেটাই সাধারণের কাছে লো প্রেসার রোগ। আজকের আলোচনায় এই ব্যাপারটাই আমাদের নজরে থাকছে।

লো প্রেসার কেন হয়?

রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের (অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম) কার্যকলাপ। সিমপ্যাথিটিক নার্ভাস সিস্টেম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় অ্যাড্রিনালিন নামক হরমোন। অ্যাড্রিনালিন রক্তনালির সংকোচন ঘটিয়ে রক্তচাপ বাড়ায়। আর প্যারাসিমপ্যাথিটিক নার্ভাস সিস্টেম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অ্যাসিটাইলকোলিন রক্তনালির প্রসারণ ঘটিয়ে রক্তচাপ কমায়।

আমরা জলের পাম্পের সঙ্গে পরিচিত। পাম্প চালিয়ে জলকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরবরাহ করা হয়। তার পেছনে কাজ করে যান্ত্রিক শক্তি। রক্ত সংবাহিত হওয়ার পেছনে যে যান্ত্রিক শক্তি কাজ করে তাকে বলে রক্তচাপ। হৃদযন্ত্র সংকুচিত হয়ে দেহের মধ্যে রক্তচাপ তৈরি হয়।

রক্তচাপ কমে যেতে পারে নিম্নলিখিত কারণে

১. হার্টের রোগে। হার্ট অ্যাটাকে হার্টের মাংসপেশির জোর কমে যায়— ফলে রক্তচাপ কমে। হার্টের ভালভগুলি বা হৃদ-কপাটিকা রক্তের একমুখি চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে। তাই হার্টের ভালভের রোগে রক্তচাপ কম হতে পারে।

২. রক্তের পরিমাণ কমে গিয়েও রক্তচাপ কম হতে পারে। প্রচুর রক্তক্ষরণ, বার বার বমি, পাতলা পায়খানা, দেহের অনেকটা অংশ পুড়ে গেলে শরীরে জলের পরিমাণ কমে যায়। বেশ কিছু মূত্রবর্ধক ওষুধ বেশি পরিমাণে খেলেও শরীরে জল কমে যেতে পারে। এ সব ক্ষেত্রে রক্তচাপ কমে যায়। তবে এগুলির অধিকাংশ সাধারণভাবে সাময়িক রক্তচাপ হ্রাসের কারণ।

৩. যেহেতু স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র দিয়ে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রিত হয় তাই নার্ভের রোগেও রক্তচাপ কমে যেতে পারে। শিরদাঁড়া ভেঙ্গে গেলে এই স্নায়ুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সে কারণে রক্তচাপ কমে যেতে পারে।

৪. সাময়িক উত্তেজনার ফলে ভেগাস নার্ভ উত্তেজিত হয়ে রক্তনালির প্রসারণ ঘটাতে পারে। একে বলে ভেসোভেগাল সিনকোপ। খুব রেগে গেলে, অপ্রত্যাশিত সাফল্যে, প্রিয়জনের কৃতিত্বে, এমনকি প্রিয়া-সন্নিধানে অজ্ঞান হওয়ার ঘটনা ঘটে যেতে পারে। রক্তচাপ কমে গিয়ে এমন হয়। হাড় ভেঙে গেলে বা হঠাৎ প্রচন্ড আঘাত পেলে ভেগাস নার্ভের ক্রিয়ায় এরকম জ্ঞান হারিয়ে যাওয়ার ঘটনাও প্রায়ই দেখা যায়।

৫. কম বয়স্ক শিশুরা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে বা সাধারণ অবস্থায় হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে। এটা হচ্ছে NMH বা নিউর‍্যালি মেডিয়েটেড হাইপোটেনশন রোগ, স্নায়ুতন্ত্রের বিকাশে বিচ্যুতি থেকে এই রোগ হয়।

৬. ভুরিভোজ বা প্রচুর খাওয়া দাওয়ার ৩০-৭৫ মিনিট পরে রক্তচাপ কমে যায়। শরীরের রক্তের বেশির ভাগটা তখন হজম করবার জন্য খাদ্যনালিতে পৌঁছে যায়। তখন মস্তিষ্কে বা হৃদযন্ত্রে রক্ত চলাচল কমে গিয়ে উপসর্গ শুরু হয়। বয়স্করা এধরনের অসুবিধায় বেশি ভোগেন। মদ খাওয়ার পরেও এধরনের রক্তচাপ কমে গিয়ে অসুবিধা হতে পারে। মেয়েদের গর্ভাবস্থায় কিছু ক্ষেত্রে রক্তচাপ কমে যেতে পারে। রক্তনালির প্রসারণই এর জন্য দায়ী।

৭. হার্টের অসুখ সরবিট্রেট বা ঐ জাতীয় ওষুধ, বা যৌনক্ষমতা বাড়ানোর জন্য সিলডেনাফিল (ভায়াগ্রা) জাতীয় ওষুধ রক্তনালির প্রসারণ ঘটিয়ে রক্তচাপ কমিয়ে দিতে পারে। এই দু'ধরনের ওষুধ তাই একসঙ্গে খাওয়া চলে না।

৮. বিভিন্ন হরমোনের মাত্রা কম থাকলে লো প্রেসার হতে পারে। যেমন থাইরয়েড, অ্যাড্রিনালিন, পিটুইটারি।

৯. অ্যালার্জি হলেও ব্লাড প্রেসার কমে যেতে পারে— যেমন পেনিসিলিন বা সালফার জাতীয় কোনও ওষুধ বা আরও কিছু ওষুধে অ্যালার্জি হয়ে হঠাৎ রক্তচাপ কমে গিয়ে জীবন সংশয় পর্যন্ত হতে পারে। রক্তনালির আকস্মিক প্রসারণে উদ্ভূত এরকম পরিস্থিতিকে বলে অ্যানাফাইলেকটিক শক।

অর্থোস্ট্যাটিক হাইপোটেনশন বা পশচুরাল হাইপোটেনশন

শরীরের অবস্থান পরিবর্তনের জন্য যেমন শোয়া

অবস্থা থেকে বসলে, বা বসা অবস্থা থেকে দাঁড়ালে কিছুক্ষণের জন্য মাথা ঝিমঝিম করতে বা চোখের সামনে অন্ধকার হয়ে যেতে পারে। এক্ষেত্রে শোয়া বা বসা অবস্থায় রক্তচাপ ঠিক থাকে। দাঁড়িয়ে পড়লে রক্তচাপ কমে যায়—এ অবস্থাকে বলে পশচুরাল বা অর্থোস্ট্যাটিক হাইপোটেনশন। রোগ নির্ণয় করতে হলে রোগীকে শুইয়ে রক্তচাপ দেখার ১-২ মিনিট পর দাঁড় করিয়ে বা বিছানা মাথার দিক উঁচু করিয়ে রক্তচাপ মেপে দেখতে হয়। অন্তত ২০ মিলিমিটার (পারদের মাপ) রক্তচাপ কমে গেলে অসুবিধা হতে পারে।

রক্তচাপ কমাবার কিছু ওষুধে, মানসিক রোগের বা প্রস্টেট গ্ল্যান্ডের রোগের কিছু ওষুধেও এরকম হতে পারে।

মিকচুরেশন সিনকোপ

বসে বা দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় চাপ দিয়ে পেচ্ছাপ বা পায়খানা করতে গেলে ভেগাস নার্ভের ক্রিয়ায় অ্যাসিটাইলকোলিনের বেশি নিঃসরণের ফলে রক্তনালির হঠাৎ প্রসারণে রক্তচাপ দ্রুত কমে গিয়ে সাময়িক অজ্ঞান হয়ে যাওয়াকে বলে মিকচুরেশন সিনকোপ। এ অবস্থা সাময়িক এবং কিছুক্ষণ পরেই রোগী ভালো হয়ে যান। তবে পড়ে গিয়ে মাথায় বা অন্য কোথাও চোট লেগে ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। তাই যাঁদের এমন অসুবিধা আছে তাঁদের পেচ্ছাপ পায়খানা করার সময় সতর্ক থাকতে হবে।

কম রক্তচাপের চিকিৎসা

অসুবিধা না হলে চিকিৎসা করার দরকার নেই। আকস্মিক রক্তচাপ কমে গেলে স্যালাইন ও ওষুধের সাহায্যে ডাক্তারবাবুরা চিকিৎসা করেন। সেটা নিয়ে এখানে আলোচনা করার দরকার নেই। তবে দীর্ঘকাল ধরে কম রক্তচাপের কারণে যাঁরা বিভিন্ন অসুবিধায় ভুগছেন সেটা নিয়ে কিছু কথা বলাই যায়।

যদি নির্দিষ্ট কোনো কারণ পাওয়া যায় যেমন কোনো ওষুধ ব্যবহারে রক্তচাপ কমে গেছে—তাহলে সেই ওষুধ বন্ধ করতে হবে। হৃদযন্ত্রের রোগ বা হরমোনজনিত কোনো রোগ পাওয়া গেলে—চিকিৎসা শুরু করতে হবে।

কম রক্তচাপের জন্য বিভিন্ন উপসর্গে যাঁরা ভুগছেন বা যাঁদের অর্থোস্ট্যাটিক হাইপোটেনশন আছে তাঁরা শোয়া অবস্থা থেকে হঠাৎ করে উঠে দাঁড়াবেন না।

বসে বা দাঁড়িয়ে পেচ্ছাপ পায়খানা করার সময় অতিরিক্ত চাপ দেবেন না।

বেশি গরম এড়িয়ে চলুন, গরম জলে স্নান করবেন না।

একসঙ্গে প্রচুর খাওয়া দাওয়া না করাই ভালো।

রক্তচাপ কমিয়ে দিতে পারে এমন ওষুধ ব্যবহার না করাই ভালো—আপনার ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আপনার এই উপসর্গ নিয়ে আলোচনা করবেন, নচেৎ তিনি না জেনে হয়তো এমন ওষুধ লিখতে পারেন যাতে আপনার এই সমস্যা বেড়ে যেতে পারে।

বিশেষ করে অর্থোস্ট্যাটিক হাইপোটেনশনে শোয়ার সময় পাতলা বালিশ ব্যবহার করুন বা বালিশ ছাড়া শোয়া অভ্যাস করুন।

কেউ যদি চোখের সামনে অন্ধকার দেখেন, আচ্ছন্ন মতো হয়ে যান তাঁকে চিৎ করে শুইয়ে পা দুটো উঁচু করে বালিশের উপরে তুলে দিন। ইলাস্টিক দেওয়া টাইট মোজা, পেটের উপর বাঁধার চওড়া পট্টি (abdominal binder) ব্যবহারে ভালো ফল পাওয়া যেতে পারে।

একটা কথা মনে রাখা দরকার, এ লেখা পড়ে অনেকেই উপসর্গ মিলিয়ে নিজেকে লো প্রেসার বা অর্থোস্ট্যাটিক হাইপোটেনশনের রোগী ভেবে নিতে পারেন। এটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভুল হবে। চিকিৎসকেরা কার্য-কারণ বিশ্লেষণ করে তবেই এ রোগ নির্ণয় করতে পারেন। অযথা আতঙ্কে না ভুগে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম মেনে চললে এই সব সমস্যায় ভালো থাকা যায়।

লেখক পরিচিতি: ডা. পার্থপ্রতিম পাল, এম বি বি এস, প্রাইভেট প্র্যাকটিস করার পাশাপাশি হাওড়া জেলায় শ্রমজীবী মানুষদের জন্য যুক্তিসঙ্গত চিকিৎসা-পরিষেবার এক কেন্দ্রে যুক্ত আছেন বহু বছর।

● **চিকিৎসা ব্যক্তির অধিকার, সমষ্টির দায়িত্ব**

পুরুষের অস্টিয়োপোরোসিস

আমাদের ধারণা অস্টিয়োপোরোসিস বুঝি কেবল মহিলাদেরই হয়, তাও বরাবরের জন্য মাসিক বন্ধ অর্থাৎ মেনোপজ হওয়ার পর। আমাদের ধারণা ঠিক নয়, অস্টিয়োপোরোসিসের রোগীদের মধ্যে ২০% পুরুষ— জানাচ্ছেন **ডা. অনিরুদ্ধ কীর্তনিয়া**।

'Pore' শব্দটার মানে 'ছিদ্র' বা 'ফুটো', অস্টিয়োপোরোসিস (Osteoporosis) শব্দটার আভিধানিক অর্থ হল 'ছিদ্রযুক্ত হাড়'। আর হাড়ে ছিদ্র সংখ্যা বেড়ে গেলে স্বাভাবিকভাবেই হাড় ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। তাই কারুর অস্টিয়োপোরোসিস হওয়া মানেই তাঁর হাড়ের ভঙ্গুরতা বেড়ে গেছে। অর্থাৎ অত্যন্ত অল্প আঘাতেই তাঁর হাড় ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

সকলের মধ্যে একটা সাধারণ ধারণা আছে যে অস্টিয়োপোরোসিস শুধুমাত্র মহিলাদেরই হয়, এটা কিন্তু পুরোপুরি ভুল ধারণা— যে সব রোগী অস্টিয়োপোরোসিসে ভুগছেন তাঁদের শতকরা ২০ ভাগ হলেন পুরুষ।

অস্টিয়োপোরোসিস পৃথিবীর সমস্ত জাতিগোষ্ঠীর মধ্যেই দেখা যায়, তবে এই রোগে ইউরোপীয় ও এশীয়রা বেশী আক্রান্ত হন, আফ্রিকান জাতিগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে এই রোগের প্রাদুর্ভাব তুলনামূলকভাবে কম। এই রোগের একটা বংশানুক্রমিক প্রবণতা দেখা যায়। কোন পরিবারের একজন মানুষের যদি এই রোগ হয়, তাহলে তাঁর সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে এই রোগ হওয়ার প্রবণতা বেশি দেখা যায়। কম ওজন ও কম উচ্চতার মানুষদের মধ্যে অস্টিয়োপোরোসিসের প্রবণতা বেশি দেখা যায়।

অস্টিয়োপোরোসিস কী?

আমাদের শরীরের হাড়গুলো জীবনের প্রথম দু'দশক ধরে আকারে বাড়ে। তারপর সেগুলো শক্তপোক্ত হতে থাকে। মোটামুটি ৩৫ বছর বয়সে হাড়গুলো সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী হয়। এরপর ধীরে ধীরে বয়স বাড়ে, হাড় পুনর্গঠনের তুলনায় হাড়ের ক্ষয় বেশি হতে থাকে। এটাই হল স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। কারুর ক্ষেত্রে এই হাড়ের ক্ষয় যদি স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে তিনি ধীরে ধীরে অস্টিয়োপোরোসিসে আক্রান্ত হয়ে পড়বেন।

অস্টিয়োপোরোসিসের মাত্রা হিসেব করা হয় হাড়ের ভর বা Bone mass (T score) দিয়ে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে—

T score:-1 SD—স্বাভাবিক

T score:-1থেকে -2.5 SD—Osteopenia (কম হাড় বা অস্থিক্ষয়)

T score:-2.5 SD-র সমান বা বেশী—অস্টিয়োপোরোসিস।

সাধারণভাবে বেশী বয়স্ক মানুষদের মধ্যে অস্টিয়োপোরোসিসের প্রবণতা বেশী দেখা যায়, কেননা বয়স্ক মানুষদের হাড়ের ভর এমনিতেই কমে। তারপর তাঁরা হাঁটাচলা বা অন্যান্য কায়িক শ্রম কম করেন, ঘরে বাইরে কম বেরোন— ফলে তাঁরা অনেক সহজেই এই রোগে আক্রান্ত হতে পারেন। দেখা গেছে ৫০ বছর বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে অস্টিয়োপোরোসিসের হার ২.৪% আর ৭০ থেকে ৮০ বছর বয়সী পুরুষদের ২০% ই অস্টিয়োপোরোসিসের শিকার।

অর্থাৎ হাঁটাচলা বা কায়িক শ্রমের সঙ্গে এই রোগ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত—যেসব মানুষ কায়িক পরিশ্রম কম করেন বা একেবারেই করেন না তাঁদের মধ্যে অস্টিয়োপোরোসিস হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশী। এছাড়া যাঁদের খাবারে কম ক্যালসিয়াম ও কম ভিটামিন ডি থাকে বা যাঁরা ঘরের বাইরে একেবারেই যান না— গায়ে একেবারেই রোদ্দুর লাগান না, তাঁদের এই রোগ হবার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

এছাড়াও পুরুষদের অস্টিয়োপোরোসিস হয় আরও কিছু কারণে—

১। কোন মানুষ দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী থাকলে।

২। শরীরে পুরুষ হরমোন 'টেস্টোস্টেরন' কম ক্ষরণ হলে।

৩। বিশেষ কিছু রোগে—ডায়াবেটিস, থাইরয়েড হরমোন কম ক্ষরণ বা বেশি ক্ষরণ দুয়েই, প্যারাথাইরয়েড হরমোন-জনিত সমস্যায়, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস ও অন্যান্য কিছু অস্থিসন্ধি-প্রদাহে।

৪। বেশি দিন ধরে কিছু ওষুধ ব্যবহার করলেও অস্টিয়োপোরোসিস হতে পারে। এই ওষুধগুলোর মধ্যে অন্যতম স্টেরয়েড, মৃগী রোগের ওষুধ, রক্ত জমাট বাঁধা রোধ করার ওষুধ।

অস্টিয়োপোরোসিস কি ভাবে বুঝবেন?

এই রোগের নিজস্ব কোন উপসর্গ নেই, কিন্তু অস্টিয়োপোরোসিসে হাড় খুব কমজোর হয়ে পড়ার ফলে বিভিন্ন হাড় খুব সহজেই ভেঙে যেতে পারে, আর হাড় ভাঙ্গার বিভিন্ন উপসর্গ তখন দেখা দেয়— ব্যথা, ভাঙ্গার জায়গা ফুলে ওঠা, ভাঙ্গা অংশ নাড়াচাড়া করতে না পারা ইত্যাদি।

সাধারণত মেরুদন্ডের হাড়, পাঁজরের হাড়, উরুসন্ধি (hip joint)-র হাড় এবং কব্জির হাড় বেশী ভাঙ্গতে দেখা যায়।

রোগ-নির্ণয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা

সাধারণ এক্স রে,

আল্ট্রাসোনোগ্রাফি,

DEXA (Dual Energy X-ray Absorptiometry)

ইত্যাদি নানা ভাবে অস্টিয়োপোরোসিস রোগ-নির্ণয় করা সম্ভব। কিছু বিশেষ রক্ত পরীক্ষাও এব্যাপারে সহায়ক হতে পারে।

অস্টিয়োপোরোসিস কি ভাবে রুখবেন?

- প্রতিদিন অন্তত ৩০ মিনিট হাঁটুন।
- ওজন নিয়ে ব্যায়াম, দৌড়ানো, নাচা, এরোবিক্স, ইত্যাদি খুব কাজে দেবে।
- সকাল হোক বা বিকেল, দিনের কিছুটা সময় গায়ে রোদ লাগালে ভাল, তাতে শরীরে ভিটামিন ডি তৈরী হতে পারে।
- পর্যাপ্ত ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন ডি আছে এমন খাবার খান।
- পটাশিয়াম শরীর থেকে ক্যালসিয়াম বেরোনো কমিয়ে দেয়, তাই পটাশিয়াম বেশী আছে এমন খাবার খাদ্য-তালিকায় রাখুন।
- অতিরিক্ত নুন শরীর থেকে ক্যালসিয়াম বেশী পরিমাণে বার করে দেয়, তাই খাবারে নুন কম খান, প্রতিদিন ২-৩ গ্রাম নুনই যথেষ্ট।
- পরিমিত প্রোটিনযুক্ত খাবার খেতে হবে, একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষের দরকার দিনে ৫৬ গ্রাম প্রোটিন।
- পরিমিত চা খাওয়া হাড়ের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল।

এসব খাবারে ক্যালসিয়াম বেশী পাবেন—

- দুগ্ধজাত— দুধ, চীজ, দই, ছানা।
- সব্জি— পালং, ঢেঁড়শ, মটরশুঁটি, বাঁধাকপি, সয়াবীন, পোস্তদানা, ছোলা, কলাই, ব্রকোলি।
- ফল— কমলা, আতা, খেজুর, আমলকি।
- বাদাম— চিনেবাদাম, আখরোট।
- মশলা— গরম মশলা, গোল মরিচ।
- প্রাণিজ— চিংড়ি, কাঁকড়া, ছোট মাছ, ডিম।

১৯ থেকে ৫০ বছর বয়সী পুরুষদের রোজ ১০০০ মিলিগ্রাম, ৫০ থেকে ৬০ বছর বা তার বেশী বয়সীদের রোজ ১২০০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম দরকার।

প্রতিদিন ২৫০ মিলি লিটার দুধ বা দই ৩০০ থেকে ৪০০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম যোগান দিতে পারে, সেই সঙ্গে প্রতিদিন অন্তত ২.৫ কাপ সব্জি এবং ২ কাপ ফল খাওয়া প্রয়োজন।

ভিটামিন ডি পাবেন এসব খাবারে—

দুধ, ডিমের কুসুম, নোনা জলের মাছ, মেটে।

৫০ বছর পর্যন্ত প্রতিদিন ২০০ IU, ৫১-৭০ বছর ৪০০ IU আর ৭০ বছরের বেশী বয়সীদের ৬০০ IU ভিটামিন ডি প্রয়োজন।

পটাশিয়াম বেশি এসবে— কলা, কমলা, মুশাম্বি, টমেটো।

যেসব জিনিস খাবেন না—

- বেশি নুনযুক্ত খাবার, যেমন প্রক্রিয়াকৃত মাংস।
- ফাস্ট ফুড— পিৎজা, বার্গার, ফ্রাই, চিপস।
- টিনের সুপ ও সব্জি।
- পাঁউরুটি, কেক।
- কফি, কোল্ড ড্রিংক্স, ইত্যাদি।

সবশেষে বলি, অস্টিয়োপোরোসিসকে এড়াতে গেলে সুষম খাবার খান, তামাক ও মদের নেশা ছাড়ুন। আনন্দে থাকুন আর হাড়ের জন্য হাঁটুন।

লেখক পরিচিতি: ডা. অনিরুদ্ধ কীর্তনিয়া, এম বি বি এস, ডি অর্থো, রেলের এক অস্থিরোগের হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ হিসেবে কর্মরত।

Acne, HairFall, Vitiligo – Do **NOT** Despair.

All are Treatable.

Consult your Dermatologist

ALKEM DERMA CARE

(Adding Value to Skin Care)

A Division of **Alkem** Laboratories Ltd

সার্জিক্যাল জন্ডিস

সবাই জানি জন্ডিস মানে হলুদ চোখ, হলুদ প্রস্রাব, খিদের অভাব আর দু-একমাসের বিশ্রাম—ব্যাস। কিন্তু এটা শুধু সাধারণ ভাইরাল হেপাটাইটিসের জন্ডিসে প্রযোজ্য। অন্য যে আরও কতরকমের কারণে জন্ডিস হতে পারে তা আমরা জানি না, আর তাই সময়মতো ডাক্তারের কাছে যাই না। এটা কিন্তু মারাত্মক হতে পারে—বিশেষ করে সেইসব ক্ষেত্রে যেখানে পিত্তের প্রবাহে বাধা পড়ার কারণে জন্ডিস হয়েছে, আর তাতে প্রায়শই অপারেশনের দরকার পড়ে। এর চলতি নাম হল সার্জিক্যাল জন্ডিস—লিখছেন **ডা. অর্কজ্যোতি মুখার্জী ও ডা. সুজয় বালা**।

কারোর জন্ডিস হয়েছে শুনলে প্রথমেই কেমন যেন ঘাবড়ে যাই আমরা—এই রে তাহলে তো 'কেস জন্ডিস'—অর্থাৎ গন্ডগোলের ব্যাপার। জন্ডিস কিন্তু আদতে কোনো রোগ নয়; এটা রোগের লক্ষণ মাত্র। বিভিন্ন কারণে এই লক্ষণ প্রকাশ পায়—কারণটা আপাত সরল থেকে বেশ জটিলও হতে পারে। তাই আমরা বলি জন্ডিস হলেই ঘাবড়াবার কিছু নেই। কিন্তু চিকিৎসা না করালে 'কেস জন্ডিস' হয়ে দাঁড়াতেই পারে।

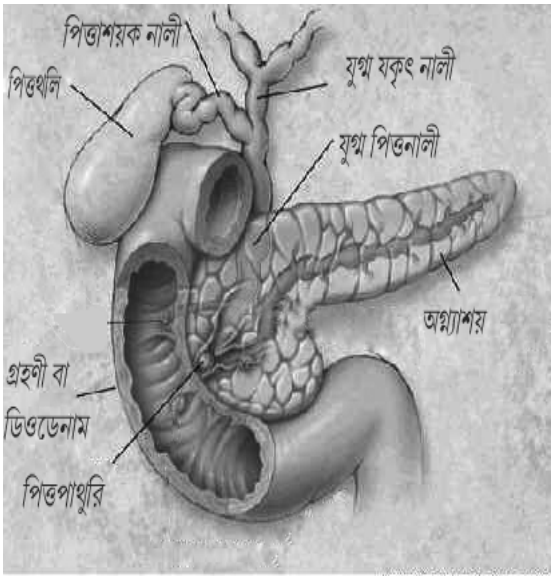

কী এই জন্ডিস?

সাধারণভাবে চোখের সাদা অংশ, প্রস্রাব, হাত-পায়ের তালু, এমনকি সারা শরীর হলুদ হয়ে যাওয়াকেই আমরা জন্ডিস বলি। এর মূল কারণ রক্তে বিলিরুবিন (bilirubin)-এর মাত্রা বেড়ে যাওয়া।

বিলিরুবিন (bilirubin)

এ আবার কী বস্তু? বিলিরুবিন হল একরকম হলুদ রঞ্জক পদার্থ (yellow pigment)। বিলিরুবিন তৈরি হয় রক্তের লোহিতকণিকায় থাকা হিমোগ্লোবিন ভেঙে। এই ভাঙার প্রক্রিয়া চলে মূলত যকৃৎ (liver), প্লীহা (spleen), হাড়ের মজ্জা (bone marrow)— এই সব অংশে। এবং তার পরবর্তী বিলিরুবিন তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়া চলে শুধুমাত্র যকৃতে; যকৃতে তৈরি হওয়ার পর পিত্তথলি, পিত্তনালী হয়ে ক্ষুদ্রান্ত্রে পৌঁছয় এবং সেখান থেকে রক্তে পৌঁছয় বিশেষ সংবহন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। এর কিছু অংশ মলের মাধ্যমে ও বাকিটা মূত্রের মধ্য দিয়ে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যেহেতু এটি একটি স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় (normal physiological process) প্রক্রিয়া তাই স্বাভাবিক নিয়মেই রক্তে কিছু পরিমাণ বিলিরুবিন থাকে। এটাও দেখা গেল যে বিলিরুবিন তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়ার সঙ্গে সবচেয়ে বেশি যুক্ত যে অঙ্গ তা হল যকৃৎ।

জন্ডিস কী কারণে হয়?

মূলত তিনটি সমস্যার জন্যই জন্ডিসের উদ্ভব হতে পারে—

১. রক্তের লোহিত কণিকার ভাঙন বেশি হলে।
২. লিভারের সমস্যা হলে।
৩. লিভারের থেকে পিত্ত ক্ষুদ্রান্ত্রে পৌঁছানোর সমস্যা হলে।

এই তিনটি মূল সমস্যার প্রত্যেকটির পিছনেই প্রচুর কারণ রয়েছে।

জন্ডিস কয় প্রকার?

আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা জন্ডিসকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করে নিচ্ছি।

১. **মেডিক্যাল জন্ডিস**—যেসব জন্ডিসের কারণ মূলত ওষুধ দিয়ে ও ডাক্তারের পরামর্শ মতো থাকলেই চিকিৎসা করা যায়। এর কারণ মূলত লিভারের গন্ডগোল বা লোহিত কণিকা দ্রুত ভেঙ্গে যাওয়া। এটি একটি পৃথক আলোচ্য বিষয় এবং সবিস্তারে আলোচনা অবশ্যই প্রয়োজন।

২. **সার্জিক্যাল জন্ডিস**—এক্ষেত্রে জন্ডিস সারানোর জন্য ওষুধ ও পরামর্শের সাথে সাথে অস্ত্রোপচার বা অপারেশন করতে হয়।

সার্জিক্যাল জন্ডিস কীভাবে বুঝব?

১. চোখ, পেচ্ছাব, সারা শরীর হলুদ হয়ে যাবে।
২. ক্ষুধামান্দ্য।
৩. সারা গা-হাত-পা চুলকাবে
৪. ফ্যাকাশে সাদা পায়খানা হবে।
৫. জ্বর হতেও পারে নাও পারে।

সার্জিক্যাল জন্ডিসের কারণ

পিত্তনালীর কোনো অংশে কোনো কারণে বাধা (obstruction) সৃষ্টি হলে রক্তে বিলিরুবিনের পরিমাণ বেড়ে যাওয়াই সার্জিক্যাল জন্ডিসের কারণ। এই কারণে একে obstructive jaundice বা 'বাধাহেতু জন্ডিস' বলা হয়। এই বাধার মূল কারণ প্রধানত তিনটি—

১. পিত্তনালীতে পাথুরী।
২. পিত্তনালীতে বড় কৃমি বা কেঁচো আটকে থাকা।
৩. ক্যানসার—বয়স্কদের ক্ষেত্রে এর সম্ভাবনা বেশি থাকে। পিত্তথলি, পিত্তনালী ও অগ্ন্যাশয়ের ক্যানসারে জন্ডিস হতে পারে।

ক্যানসারের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত যে লক্ষণগুলি প্রকাশ পাবে তা হল ওজন হ্রাস, এবং চিকিৎসক পেট টিপলে পেটের মধ্যে কোনো শক্ত মাংসপিন্ড হাতে পাবেন।

সার্জিক্যাল জন্ডিসের গুরুত্ব

মেডিক্যাল জন্ডিসের সঙ্গে সার্জিক্যাল জন্ডিসের পার্থক্য হল যে এক্ষেত্রে মূল চিকিৎসাই হল অপারেশন। যদি রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসায় দেরি করা হয় তাহলে রোগীর পক্ষে তা মারাত্মক হতে পারে—

১. পিত্তনালীর সংক্রমণ (cholangitis) হতে পারে। সেক্ষেত্রে জ্বর, পেটের উপরের দিকে বিশেষ করে ডানদিকে ব্যথা ও জন্ডিস হয়। সংক্রমণ সারা শরীরে ছড়িয়ে সেপসিস-এর মতো মারাত্মক আকার ধারণ করলে তা থেকে রোগীর 'শক' (shock)ও হতে পারে।

২. রক্তপাতের প্রবণতা দেখা দিতে পারে, যার লক্ষণ হিসেবে দাঁতের মাড়ি থেকে রক্তপাত, পায়খানার দ্বার দিয়ে রক্তপাত, খাদ্যনালীর ক্ষত বা আলসার থেকে রক্তপাত হতে পারে।

রোগ নির্ণয় করা যায় কীভাবে?

১. রক্ত পরীক্ষা

(ক) Liver Function Test অর্থাৎ লিভারের কার্যক্ষমতা নির্ধারণ পরীক্ষা—

এক্ষেত্রে বিলিরুবিনের পরিমাণ অনেকটাই বেশি হয়, সাধারণত ১০ মিগ্রা/ডেসিলিটার বা তারও বেশি। এবং তা মূলত 'কনজুগেটেড বিলিরুবিন' হিসেবে থাকে। অ্যালকালাইন ফসফাটেস নামক একটি লিভারের উৎসেচকের মাত্রা রক্তে বেড়ে যায়।

(খ) প্রোথ্রোম্বিন টাইম বা পি-টাইম রক্তপাতের প্রবণতার সূচক। এক্ষেত্রে এর মাত্রাও বেড়ে যায়।

২. পেটের ছবি (Imaging)

(ক) আল্ট্রাসোনোগ্রাফি

এই পরীক্ষায় পিত্তপাথুরী, পিত্তনালী পাথুরী পাওয়া যেতে পারে।

(খ) এম আর সি পি—

বর্তমানে সার্জিক্যাল জন্ডিস রোগ ধরার জন্য সবচেয়ে ভালো পরীক্ষা, কিন্তু এখনো খরচ সাপেক্ষ।

(গ) সি টি স্ক্যান—

যেক্ষেত্রে ক্যানসার সন্দেহ করা হচ্ছে সেক্ষেত্রে পেটের সি টি স্ক্যান করানো হয়।

চিকিৎসা

১. তেল ও চর্বিজাতীয় খাবার খাওয়া যাবে না।

২. ভিটামিন 'কে' ইঞ্জেকশন নিতে হবে।

৩. প্রয়োজনে শিরায় ডেক্সট্রোজ দ্রবণ দিতে হবে।

Liv. 52 জাতীয় ওষুধগুলো বাজারে আয়ুর্বেদিক ওষুধ হিসেবে খুব চালু। সেগুলিতে কোনো কাজ হয় না।

রোগের কারণের উপর নির্ভর করে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে চিকিৎসাও আলাদা হয়ে থাকে।

১. পিত্তনালি পাথুরী

ই আর সি পি নামক এক পদ্ধতির দ্বারা পিত্তনালী পাথুরী নিষ্কাশন করা হয় এবং এরপর প্লাস্টিক স্টেন্টিং করা হয়। এর ফলে রক্তে বিলিরুবিনের মাত্রা কমে যায় ও এর চার সপ্তাহ পর ল্যাপারোস্কোপিক কোলেসিস্টেকটমি করা হয়। যেসব ক্ষেত্রে ই আর সি পি পদ্ধতির দ্বারা পিত্তনালী পাথুরী নিষ্কাশন করা সম্ভব হয় না, সেক্ষেত্রে পেট কেটে পিত্তথলি ও পিত্তনালীর অপারেশন করা হয়।

এছাড়াও যেহেতু ই আর সি পি বা প্লাস্টিক স্টেন্টিং করতে মোটামুটি ৮০০০-১০০০০ টাকা খরচ হয় তাই অনেক ক্ষেত্রে রোগীর পক্ষে সে খরচ বহন করা সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রেও পেট কেটে অপারেশন করা হয় যা তুলনামূলক কম খরচে হওয়া সম্ভব।

২. পিত্তনালীতে বড় কৃমি থাকলে

এক্ষেত্রে রোগীকে কোনো কৃমি মারার ওষুধ দেওয়া হয় না। কারণ সেক্ষেত্রে মৃত কৃমি পিত্তনালী সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিতে পারে। এক্ষেত্রে অন্য নানারকম ওষুধ দিয়ে চেষ্টা করা হয়, তাতে কাজ না হলে তখনই ই আর সি পি-র মাধ্যমে কৃমি বার করা হয়।

৩. ক্যানসার

ক্যানসারের জায়গা ও ধরন অনুযায়ী বিভিন্ন রকম অপারেশন করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে রোগ ধরা পড়ার সময়ই ক্যানসার এত ছড়িয়ে যায় যে তাতে আর অপারেশন করে লাভ হয় না। অনেক ক্ষেত্রে কেমোথেরাপি দেওয়া হলেও তাতে খুব ভালো ফল পাওয়া যায় না।

শেষ কথা

জন্ডিস মাত্রই ওষুধের দ্বারা সারবে—এমন নয়। অনেক ক্ষেত্রেই অপারেশনের প্রয়োজন হয়। সার্জিক্যাল বা মেডিক্যাল জন্ডিস যাই হোক না কেন, সারাবার জন্য বহুল প্রচলিত তথাকথিত আয়ুর্বেদিক সিরাপ বা ট্যাবলেটের কোনো ভূমিকা নেই। জন্ডিস হলে তাকে অবহেলা করাটা বিপজ্জনক হতে পারে এবং যত দ্রুত সম্ভব চিকিৎসকের কাছে যাওয়া ও তার পরামর্শ অনুযায়ী রক্ত পরীক্ষা অবশ্যই করানো উচিত। যদি জন্ডিসের সঙ্গে সারা গায়ে চুলকানি ভাব ও সাদাটে পায়খানা হয়, সেক্ষেত্রে সার্জিক্যাল জন্ডিসের সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে শল্যচিকিৎসকের পরামর্শ অবশ্যই নেওয়া উচিত। বিশেষত, বয়স্ক মানুষদের ক্ষেত্রে ক্যানসারের কথা মাথায় রাখতে হয়। এক্ষেত্রে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার দেরি হলে ক্যানসার ছড়িয়ে পড়ার যথেষ্ট সম্ভাবনাও থাকে। তাই জন্ডিস হলে কোনো টোটকা নয়, 'আয়ুর্বেদিক' ওষুধ নয়, চিকিৎসকের কাছে যাওয়াই শ্রেয়।

- জন্ডিস কোনো একটি রোগ নয়, কয়েকটি রোগের সাধারণ লক্ষণ মাত্র।
- জন্ডিস মূলত দু রকমের— মেডিক্যাল আর সার্জিকাল জন্ডিস।
- সার্জিক্যাল জন্ডিসে চোখ, হাত-পা ও প্রস্রাব তো হলুদ হয়ই, তার সঙ্গে পায়খানার রঙ সাদাটে হয়ে যায় ও সারা গা চুলকায়।
- পিত্তের প্রবাহ পথে বাধা সৃষ্টি হবার ফলে সার্জিক্যাল জন্ডিস হয়, আর সাধারণত এই বাধা কেবল সার্জারির সাহায্যেই দূর করা যায়।
- দ্রুত ডাক্তার দেখান আর অকেজো 'লিভারের ওষুধ' খেয়ে পয়সা, সময় ও স্বাস্থ্য নষ্ট করবেন না।

লেখক পরিচিতিঃ ডা. অর্কজ্যোতি মুখার্জী কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন।
ডা. সুজয় বালা, এম বি বি এস, এম এস, বর্তমানে ক্যানসার সার্জারিতে উচ্চতর প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন।

শিশুর খাবার বিচার

মায়েরা আজকাল বাচ্চার খাওয়া-না-খাওয়া নিয়ে বড় বেশি বিব্রত। বাচ্চা যে নিজের বাঁচার তাগিদেই তার দরকার মতো খাবে, সেটা তাঁরা মানতেই চান না, কল্পিত 'খিদের অভাব' বা ' পেট ভরছে না' এইসব ধারণায় হাতে তুলে নেন ফিডিং বোতল। বাচ্চা একবার ফিডিং বোতলে অভ্যস্ত হয়ে গেলে সে আর মার দুধ টানতে চায় না। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো রয়েছে হরেক-রকম স্বাস্থ্যবর্ধক পানীয় বা হেলথ ড্রিংক। বহু পয়সা খরচ করে সেই পানীয় খেলে বাচ্চার সুষম আহার পাবার কিছুমাত্র সুরাহা হয় না। আর বড়লোক-মধ্যবিত্তের দেখাদেখি গরীব মানুষ ওগুলোকে অমৃতজ্ঞানে কিনে বাচ্চাকে খাওয়ান, ফলে তার চাইতে অনেক কম খরচে দৈনন্দিন খাবার থেকে বাচ্চা যে পুষ্টি পেতে পারত তার থেকে সে বঞ্চিত হয়— লিখছেন **ডা. অলোক হালদার।**

'ডাক্তারবাবু আমার বাচ্চা কিচ্ছু খাচ্ছে না, জোর করে খাওয়াতে গেলে খালি বমি করে, এতো দুষ্টু। স্বাস্থ্য একদম ভালো হচ্ছে না। একবছর ধরে প্রথমে হরলিক্স্, কমপ্ল্যান, তারপর পিডিয়াসিওর খাওয়াচ্ছি, কিন্তু কোনো উন্নতি নেই। আপনি খাবারের একটা চার্ট করে দিন, আর কী কী হেলথ ড্রিংক বা ভিটামিন খাওয়াবো তা বলে দিন।'

১ থেকে ৪/৫ বছর বয়সের বাচ্চার মায়েদের এই উদ্বেগ আর প্রশ্ন সারাদিনে কতবার যে শুনতে হয় তার শেষ নেই। এর থেকেও আশ্চর্য কথা শোনা যায় ১ মাস থেকে ৬ মাস বয়সের বাচ্চার মায়েদের কাছ থেকে— 'ডাক্তারবাবু আমার বাচ্চা দুধ পাচ্ছে না— কত চেষ্টা করছি তবু কিছুতেই বুকের দুধ টানছে না। ফিডিং বোতলে খাচ্ছে কিন্তু বুকের দুধ দিলেই মুখ সরিয়ে নিচ্ছে। গরুর দুধ খাওয়াবো? কোন কৌটোর দুধ খাওয়ালে ভালো হয়, খুব পাতলা করে খাওয়াবো কিনা বলে দিন।'

কেন ফিডিং বোতল নয়?

শেষের প্রশ্নের উত্তর থেকেই শুরু করা যাক। 'বুকের দুধ সর্বশ্রেষ্ঠ, জন্ম থেকে ৬ মাস পর্যন্ত'— একথা সব মায়েদেরই পরিচিত কথা কিন্তু দুঃখের কথা এই যে এই শ্লোগান বা প্রচার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যে মায়েদের ও পরিবারের বয়স্ক মহিলাদের এব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাতে পারে না, তা তাদের কথাতেই স্পষ্ট বোঝা যায়। 'কী করবো! বাচ্চা কাঁদছে, বুকের দুধ টিপলেও বেরোচ্ছে না, বুকের দুধ খাওয়ার পরেও ফিডিং বোতলে দুধ দিলে খেয়ে নিচ্ছে।' বা, 'বুকের দুধ খেয়ে বমি করছে তাই পরে তোলা দুধ খাওয়াতে হচ্ছে।'

শতকরা ৯০ ভাগ মা-ঠাকুমা-দিদিমার ধারণা বাচ্চা কাঁদা বা বুকের দুধ খাওয়ার পরেও অন্য দুধ খাওয়ার মানে— নিশ্চিত ভাবেই বুকের দুধ কম হচ্ছে। এই ধারণা একদম ভিত্তিহীন বা ভুল। সাধারণভাবে বুকের দুধ যথেষ্ট হচ্ছে কিনা বা বাচ্চা পরিমাণমত খাচ্ছে কিনা তা বোঝার সবচেয়ে সহজ উপায় হল বাচ্চার প্রস্রাব দেখা ও ওজন মাপা। বাচ্চা যদি শুধুমাত্র বুকের দুধ খেয়ে ২৪ ঘণ্টায় ৭/৮ বারের বেশি প্রস্রাব করে অথবা ১ মাসে তার ৭০০/৮০০ গ্রাম বা তার বেশি ওজন বাড়ে তাহলে নিশ্চিত হওয়া যায় যে বাচ্চা ঠিকমতো বুকের দুধ খাচ্ছে। যদি কান্নার অন্য কারণ না থাকে তবে বার বার বুকের দুধই দিতে হবে অন্য কিছু নয়। অন্তত প্রথম ৫-৬ মাস আর কোনোকিছু দেবেন না। ১-২ মাসের বাচ্চাকে একবার বোতলে দুধ খাওয়ানোর ভুলটা করে বসলে সে বাচ্চা ফিডিং বোতলের নিপ্‌লে খেতে সহজেই অভ্যাস করে ফেলে। পরে কিছুতেই মায়ের বুকের দুধ মায়ের নিপ্‌ল বা স্তনবৃন্ত থেকে বাচ্চা টানতে পারে না, বা অসুবিধা বোধ করে। ডাক্তারি পরিভাষায় একে বলে নিপ্‌ল কনফিউসান। মায়ের স্তনের স্তনবৃন্ত আর বোতলের নিপ্‌ল-এ দুটি টানার পদ্ধতি দুরকম। ছোট্ট বাচ্চা স্বভাবতই যেকোনও একটি পদ্ধতি শিখে নেয়, তারপর অন্য পদ্ধতিতে সে নিজেকে অভ্যস্ত করতে পারে না। সঠিক পরামর্শ হল ফিডিং বোতলে কখনও দুধ খাওয়াবেন না, যদি কখনও বাইরের দুধ খাওয়াতেই হয় তবে তা বাটি চামচে খাওয়ানো যেতে পারে।

ছ-মাস বয়সের পর?

এবার আসি প্রথম প্রশ্নের প্রসঙ্গে। বাচ্চাকে ৬ মাস থেকে লেই বা সামান্য দানাযুক্ত বাড়ির খাবার (যেমন আলুসেদ্ধ, খিচুড়ি, পাকা কলা ইত্যাদি) শুরু করতে হবে। তবে ৮-৯ মাস বয়সে সে কিছুটা খেতে শিখবে এবং এক বছর বয়সে বাবা-মার সঙ্গে বসে সুন্দরভাবে বাড়ির রান্না খেতে পারবে। এই পদ্ধতিটা খুবই ধীরে ধীরে ও ধৈর্য ধরে করা উচিৎ। বাচ্চারও কিন্তু পছন্দ-অপছন্দ আছে, তারও মেজাজ-মর্জি আছে। সবচেয়ে ভালো মা তিনিই যিনি প্রথম ছ'মাস শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়ান এবং তারপর বুকের দুধের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির তৈরি শক্ত খাবার ধীরে ধীরে খাওয়াতে শুরু করেন যাতে বাচ্চা দেড় বছরে প্রায় মায়ের ২৪ ঘন্টার খাবারের অর্দ্ধেক (৫০ %) পরিমাণ খাবার খেতে পারে। অবশ্যই এই সময়ের মধ্যে কোনও রকম কৌটোর দুধ, খাবার বা হেলথ ড্রিংক যেন না খাওয়ানো হয়।

আর একটি ব্যাপার বলা জরুরি। মায়েরা ধৈর্য হারিয়ে অনেক সময় বাচ্চাকে চেপে ধরে ঝিনুকে করে খাওয়ানোর (?গেলানোর) চেষ্টা করতে

থাকেন। এই ব্যবস্থা একেবারেই সঠিক নয়। ঝিনুকে খাওয়ানোর সময় ঝিনুক দিয়ে জিভ নীচের দিকে চেপে ধরে খাবার (শক্ত/তরল) জিভের পিছনভাগে ঢেলে দেওয়া হয়, ফলে বাচ্চা বাধ্য হয় গিলে নিতে এবং এটাই অভ্যাসে পরিণত হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন হাতে অথবা চামচে করে খাবার জিভের সামনের দিকে দেওয়া হয় তখন সে বিভ্রান্ত (confused) হয়ে গিয়ে মুখ থেকে খাবার ফেলে দেয় অথবা বিষম খায়। এর ফলে তাড়াতাড়ি শেখানোর বদলে খাওয়া সঠিকভাবে শেখাতে অহেতুক দেরী হয়ে যায়।

হেলথ ড্রিংক— কেন এত রমরমা?

হেলথ ড্রিংক সম্পর্কে বলতে গেলে মিডিয়ার ভূমিকার কথা না বলে উপায় নেই। মিডিয়ার কল্যাণে, বিশেষত টিভির বিজ্ঞাপন দেখে মায়েদের বদ্ধ ধারণা হয় হরলিক্স্, কমপ্ল্যান, পিডিয়াসিওর ইত্যাদি খাওয়ালে তাদের বাচ্চারা বিজ্ঞাপনের বাচ্চাদের মতো অবিশ্বাস্যভাবে স্বাস্থ্যবান ও তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন হবে আর তাড়াতাড়ি লম্বা হয়ে উঠবে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে যেসব মা-বাবার প্রতিদিন বাচ্চাকে একটি ডিম, একটুকরো মাছ, একপোয়া দুধ ও একটি ফল খাওয়ানোর সঙ্গতি নেই তাঁরা বিজ্ঞাপনে বিভ্রান্ত হয়ে যেন তেন প্রকারেণ একটি হরলিক্স্, কমপ্ল্যান বা পিডিয়াসিওর কিনে রোজ অল্প করে সেটাই খাইয়ে আত্মতৃপ্ত হন এবং নিশ্চিন্ত বোধ করেন। প্রতিদিনের স্বাভাবিক সুষম খাবারের (যার মধ্যে আছে ভাত, ডাল, খিচুড়ি, রুটি, সুজি, দুধ, মাছ, ডিম, ফল, সবজি, তরকারি, চিনি, গুড়, তেল) মধ্যে যে ঐসব হেলথ ড্রিংকের থেকে অনেক বেশি পরিমাণ কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট, ভিটামিন ও খনিজ লবণ থাকে তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাঁদের বোঝানো সম্ভব হয় না। এটা আমাদের অক্ষমতা এবং বিজ্ঞাপনদাতাদের চাতুরি। হেলথ ড্রিংক-এর কয়েকটিতে কোন খাদ্যবস্তু কতটা পরিমাণে থাকে তার একটা তালিকা সঙ্গে দিলাম। এই তালিকা থেকে বোঝা যায় যদি কোনও তিন-চার বছরের বাচ্চাকে একদিনে ১০০ গ্রাম পরিমাণ হেলথ ড্রিংক খাওয়ানো হয় তবে সেই বাচ্চা তার একদিনের প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের (কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট, ভিটামিন ও খনিজ লবণ কোনোটার অর্ধেক, কোনোটার অর্ধেকের বেশি, কোনোটা বা অর্ধেকের কম— এরকম পাবে; মোটের ওপর দরকারি পুষ্টি ও খাদ্যদ্রব্যের অর্ধেকটা পাবে এরকম আমরা বলতে পারি। কিন্তু তারপরেও আমাদের মনে রাখতে হবে এই অর্ধেক পাওয়াও কিন্তু বাচ্চার প্রয়োজনীয় সুষম খাবারের অর্ধেক নয়, কেননা কোনোটা সে অপ্রয়োজনীয়, এমনকি ক্ষতিকর রকমের বেশি পেল, কোনোটা বা পেল ভীষণ কম পরিমাণে।

এবার সারাদিনে ১০০ গ্রাম হেলথ ড্রিংক-এর গড় দাম কত? হরলিক্স্, কমপ্ল্যান বা পিডিয়াসিওর-এর কথাই ধরি— এদের প্রতিটির চারশ গ্রাম কৌটোর মূল্য তিন-চারশ টাকা। তার মানে কী দাঁড়াল? একশ গ্রাম হেলথ ড্রিংক যা একজন তিন-চার বছরের শিশুর একদিনের সুষম খাবারের অর্ধেকটাও দেবে না, তার খরচা হল ৭৫ থেকে ১০০ টাকা। মাসে আড়াই হাজার থেকে তিন হাজার টাকা। সেই টাকার ডবল খরচ করলে কেবল হেলথ ড্রিংক খাইয়ে বাচ্চার সারাদিনের পুষ্টি যোগানো যায়। কিন্তু সেটা আরও বিপজ্জনক, কেননা তাতে অনেক অণুখাদ্য/ভিটামিন অতিরিক্ত পরিমাণে শরীরে ঢুকবে, যা ক্ষতিকর। আবার অনেক অণুখাদ্য/ভিটামিন শরীর পাবেই না যা আবার অন্যদিকে ক্ষতিকর। একটু ভালো করে হিসাব করলেই বোঝা যায় প্রতিদিনের সুষম (balanced) বাড়ির তৈরি খাবারে বিজ্ঞাপনদাতাদের দেওয়া তালিকার থেকে অনেক বেশি পরিমাণে খাদ্যঅণুকণা ও শক্তি থাকে। বাইরের ভিটামিন বা হেলথ ড্রিংক খাওয়ানোর প্রয়োজন আদৌ নেই। আর আমাদের দেশে প্রায় অর্ধেক শিশু অপুষ্টির শিকার। তাদের মা-বাবারা ভুল বুঝে হেলথ ড্রিংক খাওয়াতে গিয়ে শিশুর বাড়িতে পাওয়া স্বাভাবিক পুষ্টিকর খাদ্যের পয়সা যোগাতে পারবেন না, এর চাইতে অনৈতিক নিষ্ঠুর ব্যাপার কল্পনাতেও আনা শক্ত। কিন্তু বিজ্ঞাপনের এমন মহিমা যে প্রথমে উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্তের হাত ধরে ঢুকে হেলথ ড্রিংক এমন এক মর্যাদার আসন পেয়ে যায় যে গরিব মানুষ ভাতের বদলে ঐসব কিনছেন।

উদ্বেগের আর একটা কারণ হল প্যাকেটে খাবার দীর্ঘদিন (এক বছর বা তার বেশী সময়) ভালো রাখার জন্য যে পরিমাণ সংরক্ষক (preservative) ব্যবহার করা হয় তা স্বাস্থ্যের পক্ষে কতটা নিরাপদ সেটা একেবারেই অপ্রমাণিত। বিশেষ করে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য অনেক সময়ে বহুদিন পরেও নানা রকম শারীরিক ক্ষতির জন্ম দিতে পারে। সংরক্ষকগুলি মানব দেহের পক্ষে দীর্ঘমেয়াদি বিচারে কতটা নিরাপদ সে ব্যাপারে খুব বেশি তথ্য নেই, তাই সাবধানে থাকাই ভালো।

সুতরাং সাধু সাবধান। এই বিশ্বায়নের যুগেও যতদিন বাজারের চাল, ডাল, মাছ, ডিম, টাটকা সবজি, ফল পাওয়া যায় ততদিন বাজার করিব রাঁধিব বাড়িব খাইব সুখে— নিশ্চিন্তে। বোতলের দৈত্য বোতলেই থাকুক।

- ছ'মাস বয়স পর্যন্ত বাচ্চার একমাত্র যথাযথ আহার মায়ের দুধ।
- ভুলেও ফিডিং বোতল ধরাবেন না, তাতে বাচ্চা আর বুকের দুধ টানতে চাইবে না, আর ভুগবে অপুষ্টি ও ব্যাধিতে। ঝিনুকে খাওয়াবেন না।
- ছ'মাসের পর থেকে নরম বাড়ির খাবার শুরু করুন।
- একবছর বয়সে বাচ্চা বাড়ির সবার সাথে বাড়ির তৈরি প্রায় সব খাবারই খাবে।
- বিভিন্ন স্বাস্থ্যবর্দ্ধক পানীয় মোটেও সুষম আহার নয়, বাড়ির সাধারণ খাবারই বাচ্চার পক্ষে যথেষ্ট ও সুষম।
- এইসব হেলথ ড্রিংকে পয়সা খরচ করে বিপদ ডেকে আনবেন না, আর গরিব মানুষ এইসব কিনে বাচ্চার বাড়ির খাবার কিনবার পয়সা খোয়াবেন না।

কয়েকটি হেলথ ড্রিংকের প্রতি ১০০ গ্রামে অনুখ্যাদ্যের পরিমাণ ও বাচ্চাদের শরীরে সেইসব খাদ্যের দৈনিক চাহিদা

পৌষ্টিক তত্ত্ব (Nutrient)	হরলিক্স (জে)	কমপ্ল্যান	পিডিয়াসিওর	৩-৪ বছরের বাচ্চার পুষ্টির জন্য প্রতিদিন যতটা প্রয়োজন
১. প্রোটিন	১৫.২ গ্রাম	১৮ গ্রাম	১৪.১ গ্রাম	২৫-৩০ গ্রাম
২. ফ্যাট	৪ গ্রাম	১১ গ্রাম	২৩.৪ গ্রাম	৪০-৪৫ গ্রাম
৩. কার্বোহাইড্রেট	৭২.৪ গ্রাম	৬২ গ্রাম	৫০.২১ গ্রাম	১৫০-২০০ গ্রাম
৪. ক্যালোরি	উল্লেখ নেই	উল্লেখ নেই	২৮০	১২৫০-১৬০০
৫. ক্যালসিয়াম	৮৩৩.৩ মিগ্রা	৮০০ মিগ্রা	৩৬৮ মিগ্রা	৪০০-৫০০ মিগ্রা
৬. ফসফরাস	—	৭৮০ মিগ্রা	২৪০ মিগ্রা	৫০০-১০০০ মিগ্রা
৭. ম্যাঙ্গানিজ	—	১.৫ মিগ্রা	০.৯৮ মিগ্র	১-২ মিগ্রা
৮. ম্যাগনেসিয়াম	—	৭০ মিগ্রা	৭৮ মিগ্রা	২০০-৩০০ মিগ্রা
৯. সোডিয়াম	—	৪০০ মিগ্রা	১৮১ মিগ্রা	৪-৫ গ্রাম
১০. আয়রন	১৯.৩ মিগ্রা	১৩.৫ মিগ্রা	৫.৫ মিগ্রা	১২-১৬ মিগ্রা
১১. অয়োডিন	৭৫ মাইক্রোগ্রা	১১০ মাইক্রোগ্রা	৩৮ মাইক্রোগ্রা	৫০-১০০ মাইক্রোগ্রা
১২. কপার	২৮০ মাইক্রোগ্রা	৫৪০ মাইক্রোগ্রা	৪০০ মাইক্রোগ্রা	৮০০-১০০০ মাইক্রোগ্রা
১৩. জিংক	৩.৪ মিগ্রা	৪.৫ মিগ্রা	৩.৫ মিগ্রা	৫-১৫ মিগ্রা
১৪. সেলেনিয়াম	১৪.২মাইক্রোগ্রা	১৫ মাইক্রোগ্রা	১২.৩ মাইক্রোগ্রা	৫০ মাইক্রোগ্রা
১৫. মলিবডেনাম	—	১১মাইক্রোগ্রা	১৯.৭ মাইক্রোগ্র	২৫০ মাইক্রোগ্রা
১৬. ক্রোমিয়াম	—	৭.৫ মাইক্রোগ্রা	১২ মাইক্রোগ্রা	১০ মাইক্রোগ্রা
১৭. ভিটামিন কে	১২.৫ মাইক্রোগ্রা	৪৫ মাইক্রোগ্রা	১৭.৫ মাইক্রোগ্রা	নির্দিষ্ট নয়
১৮. ভিটামিন ডি	৪.২ মাইক্রোগ্রা	৩.৭৫ মাইক্রোগ্রা	৩.১৫ মাইক্রোগ্রা	১০ মাইক্রোগ্রা
১৯. ভিটামিন এ	৩৩৩ মাইক্রোগ্রা	৩১৮ মাইক্রোগ্রা	৩০৫ মাইক্রোগ্রা	৫০০ মাইক্রোগ্রা
২০. ভিটামিন ই	৪.২ মিগ্রা	৩ মিগ্রা	১১ মিগ্রা	১০-২০ মিগ্রা
২১. ভিটামিন সি	৫০ মিগ্রা	৩০ মিগ্রা	৪৪ মিগ্রা	৪০ মিগ্রা
২২. ভিটামিন বি$_১$	০.৪২ মিগ্রা	০.৪৫ মিগ্রা	০.৯ মিগ্রা	০.৯ মিগ্রা
২৩. ভিটামিন বি$_২$	০.৮২ মিগ্রা	০.৫৭ মিগ্রা	১ মিগ্রা	১ মিগ্রা
২৪. ভিটামিন বি$_৬$	০.৮৩ মিগ্রা	০.৭৬ মিগ্রা	১.৫ মিগ্রা	০.৯ মিগ্রা
২৫. ভিটামিন বি$_{১২}$	১.৫ মিগ্রা	০.৭৬ মিগ্রা	১.৫ মিগ্রা	১ মিগ্রা
২৬. নিয়াসিনামাইড	৫ মিগ্রা	৬ মিগ্রা	৭ মিগ্রা	৫-১৫ মিগ্রা
২৭. ফলিক অ্যাসিড	২৫০ মাইক্রোগ্রা	---	১০০ মিগ্রা	৪০ মাইক্রোগ্রা

লেখক পরিচিতি: ডা. অলোক হালদার, এম বি বি এস, ডি সি এইচ, শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ; প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

With Best Compliments from

SHINE PHARMACEUTICALS LTD.

P-77, Kalindi Housing Estate
Kolkata- 700089

মাতৃদুগ্ধ নিয়ে দু-চার কথা

আজকাল সবাই জানেন শিশুর জন্য তার মায়ের দুধই সবসেরা, তার জীবনের প্রথম কয়েক মাস মায়ের দুধ ছাড়া আর কিচ্ছুটি দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু তবু কোন্ ছিদ্রপথে বাড়িতে ঢুকে পড়ে কৌটোর দুধ, বোতল? আলোচনা করছেন **ডা. নীনা ঘোষ**।

আপনি কি জানেন মায়ের বুকের দুধ শিশু খেলে কার উপকার ?

— বাচ্চার? হ্যাঁ, তার তো বটেই।

— মায়ের? হ্যাঁ, তাঁরও।

— মা ও বাচ্চার দুজনের একসাথে, দুজনের বন্ধনের।

— গোটা পরিবারের, এবং সমাজের, রাষ্ট্রের, পৃথিবীর।

আমরা সবাই অন্তত এটুকু জানি যে মা আর শিশুর উপকার হয়। কিন্তু মায়ের দুধ খাবার অন্য সুদূরপ্রসারী যে উপকার, তার সম্পর্কে কতটুকু জানি? সেই উপকার আর সুবিধার পুরো তালিকা এই প্রবন্ধে আমি দিতে যাব না, কারণ তা গোটা প্রবন্ধের আয়তন ছাপিয়ে যাবে। কিন্তু মোদ্দা কথাটা বোঝা মোটেই শক্ত নয়— বাচ্চা মায়ের দুধ খেলে গোটা পরিবারের লাভ। বাচ্চা ও মায়ের স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, পরিবারের কষ্টার্জিত অর্থ বাঁচবে, কেননা দামি কৌটোর দুধ কিনতে হবে না, আর ডাক্তারের ফি ও ওষুধের দাম দিতে গিয়ে ফতুর হতে হবে না।

অথচ দেখুন, এই লেখাটা লিখতে শুরু করার সময়ে আমার মনে একটা অদ্ভুত ভাবনা এল। মায়ের দুধ খাওয়ানোর এত সুফল তো বিগত

মায়ের দুধ খাওয়ানোর এত সুফল তো বিগত কয়েক দশক ধরেই আমরা জানি। তবু আজও কেন ডাক্তার বা স্বাস্থ্যকর্মীদের মানুষকে এখনও এব্যাপারে ‘শিক্ষাদান’ করতে হয়?

কয়েক দশক ধরেই আমরা জানি। তবু আজও কেন ডাক্তার বা স্বাস্থ্যকর্মীদের মানুষকে এখনও এব্যাপারে ‘শিক্ষাদান’ করতে হয়? কেন অনেক মা এখনো তাঁদের শিশুদের অন্য দুধ খাওয়ান, বিভিন্ন কোম্পানির কৌটোর দুধ খাওয়ান? অথচ তাঁদের জিজ্ঞেস করলে একবাক্যে বলেন , হ্যাঁ, মায়ের দুধই

সবচাইতে ভালো! আমি যখনই দেখি কোনো মা বাচ্চাকে বোতলে করে দুধ খাওয়াচ্ছেন, আমি তাঁকে প্রশ্ন করি— আপনার বাচ্চার জন্য কোন্ দুধ সবচেয়ে ভালো? এখন আর কোনো মা-ই বলেন না যে তাঁর বুকের দুধের চাইতে কোনো কোম্পানির তৈরি দুধ ভালো। সত্যি কথা বলতে কি প্রায় অবধারিতভাবেই বলেন— হ্যাঁ, আমি জানি আমার বুকের দুধের চাইতে ভালো আর কোনো কিছু হতেই পারে না।

আজব কান্ড, তাই না? যদি তিনি জানেন যে তাঁর বাচ্চার জন্য মাতৃদুগ্ধই শ্রেষ্ঠ, তাহলে তিনি খামোকা জেনেশুনে তার চাইতে কমা জিনিস বাচ্চাকে খাওয়াচ্ছেন কেন? তার মাথায় ‘অন্য দুধ খাওয়াতে হবে’— এ চিন্তা কে ঢোকালো?

বিজ্ঞাপনের হাত

আর এই প্রশ্নটা থেকেই আমাদের আসতে হয় বিজ্ঞাপন আর তার ক্ষমতার প্রসঙ্গে। আমার মনে হয় বিজ্ঞাপন ব্যাপারটা আপাতদৃষ্টিতে যতটা সরল লাগে ততটা সরল বিষয় নয়। বিজ্ঞাপন মানে আমাদের কেবল একটা বস্তুর সম্পর্কে আমাদের ‘জানিয়ে দেওয়া’—তা আসলে নয়।

আচ্ছা আপনার কি মনে হয়? যদি কোনো জিনিস কাজের জিনিস না হয় তাহলে কোনো রকম বিজ্ঞাপনী কায়দা দিয়ে আপনাকে সেই জিনিসটি কেনানো যাবে না? আপনি হয়তো সত্যিই বুদ্ধিমান, শিক্ষিত এবং নিজের মাথা খাটিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে অভ্যস্ত। তার মানে কি এই যে বিজ্ঞাপন দিয়ে আপনাকে প্রভাবিত করা যাবে না?

ব্যাপারটা উল্টো দিক থেকে ভাবুন। যদি বিজ্ঞাপন একজন মানুষকে প্রভাবিত করতে না পারে, তবে সে ব্যাপারটা কি বিজ্ঞাপন কোম্পানি-গুলোর অজানা? নাকি পৃথিবীতে বোকা লোকের সংখ্যা এত বেশি যে বিজ্ঞাপন দিয়ে খালি বোকা লোকদের প্রভাবিত করলেই চলে যায়? আর বোকা লোকদের হাতেই বা এত টাকা থাকে কি করে যে পৃথিবীর সমস্ত অকেজো ফালতু জিনিস কেবল তারাই কিনে ফেলতে পারে? আমরা তো চিরকাল জেনেছি— পড়াশুনা করে যে গাড়িঘোড়া চড়ে সে। মানে শুধু স্কুলের পড়াশুনার কথা বলছি না কিন্তু। যে জীবন থেকে শিক্ষা নিতে পারে সেই সাফল্য পায়— পার্থিব সাফল্য, আর্থিক সাফল্য। সেই সফল লোকটা কি বোকা? আর যে ‘সফল’ নয়, তার তো বেশি কিছু কেনার সামর্থ্যই নেই।

সত্যি কথাটা হল বিজ্ঞাপন আমাদের সবাইকেই প্রভাবিত করে। সব বিজ্ঞাপন-কোম্পানি সেটা জানে। আর বিজ্ঞাপন-কোম্পানির পেছনে পয়সা ঢেলে চটকদার বিজ্ঞাপন তৈরি করে যেসব ‘পুষ্টিকর খাদ্য’-কোম্পানি, তারাও সেটা জানে। সেজন্য সারা পৃথিবী জুড়ে এইসব কোম্পানি ‘বিজ্ঞাপন দেবার অধিকার’-এর জন্য লড়ছে। সিগারেট কোম্পানিগুলো যেমন জানে সিগারেট খাওয়া ক্ষতিকর, কিন্তু সিগারেটের বিজ্ঞাপন বিভিন্নভাবে দেবার চেষ্টা তারা ছাড়ে নি, তেমনি ‘ফর্মূলা ফুড’ তথা বেবিফুড কোম্পানিগুলোও ভালো করেই জানে তাদের তৈরি খাদ্যটির তুলনায় মায়ের দুধ অনেক ভালো, কিন্তু তারা সরাসরি বা চোরাগোপ্তা বিজ্ঞাপনের

জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করছে, কেননা সে টাকা কয়েকগুণ হয়ে তাদের কাছে ফেরত আসবে।

মায়ের কথা

বাচ্চা জন্মানোর সাথে সাথে নতুন মা ভাবতে থাকেন— কি খাওয়াবো? যখন আমরা বলি 'শুধুমাত্র মায়ের দুধ', তাঁরা অবাকই হয়ে যান। মাতৃদুগ্ধ শ্রেষ্ঠ জেনেও তাঁদের এই প্রতিক্রিয়া হল বেবি ফুড প্রস্তুতকারকদের বাজার-দখলের প্রবল প্রচেষ্টার ফসল। লক্ষ্য করবেন আমি এখানে কিন্তু 'বিজ্ঞাপন' কথাটা ব্যবহার করছি না। আমাদের দেশে শিশুর জন্য ফর্মূলা-ফুড তথা বেবি ফুডের বিজ্ঞাপন বেআইনি। কিন্তু বাজার-দখলের নানা কায়দা আছে—

— মধ্যবিত্ত মা-বাবাদের বিনা পয়সায় 'স্যাম্পল' বিতরণ।

— মা-কে বিভিন্ন কায়দায় বোঝানো যে তাঁর দুধ 'যথেষ্ট' নয়।

—স্বাস্থ্যকর্মীদের উপঢৌকন আর স্যাম্পল দেওয়া, যাতে তাঁরা বেবি ফুডটি ব্যবহার করায় সহায়তা করেন।

—এবং সবথেকে কার্যকর উপায় হল, মা যখন বাচ্চা হবার আগে বা পরে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন তখন যেন-তেন-প্রকারে তাঁর শিশুটিকে বেবি ফুড ধরিয়ে দেওয়া যাতে শিশুটি বোতলে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে আর বাড়ি গিয়েও বুকের দুধ টানতে চায় না। হাসপাতালে মা'কে বোঝানো তুলনায় সহজ।

আইন কী বলছে?

বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে এক-একটি দেশে এক-এক রকম আইন। আগেই বলেছি, আমাদের দেশে

> নাকি পৃথিবীতে বোকা লোকের সংখ্যা এত বেশি যে বিজ্ঞাপন দিয়ে খালি বোকা লোকদের প্রভাবিত করলেই চলে যায়?

একেবারে ছোট শিশুদের জন্য তৈরি 'ফর্মূলা ফুড'-এর বিজ্ঞাপন দেওয়া নিষিদ্ধ। কিন্তু এই ফর্মূলা ফুড তৈরি করে যেসব কোম্পানি তারা আবার অন্য ধরনের খাবার তৈরি করে, বাচ্চাদের ব্যবহারের অন্য জিনিসপত্র তৈরি করে— এবং

> সাধারণ পরিবারগুলিতে যদি একজন বাচ্চাকে বোতলের দুধ ঠিকঠাক খাওয়াতে হয়, তাহলে পরিবারের অন্য ছোটবড় সদস্যের পুষ্টিকর খাদ্য জোটানো অসম্ভব।

সেগুলোর বিজ্ঞাপন করে। মায়ের কাছে ব্যাপারটা গুলিয়ে যায়, তিনি কোম্পানির তৈরি একটি খাবার (ধরুন হেলথ ড্রিংক) বিজ্ঞাপনে দেখেন, এবং সেই কোম্পানির অন্য খাবার (বেবি ফুড) বিজ্ঞাপনে না থাকলেও তাঁর মাথাতেই আসে না এ-দুটোর মধ্যে বড় ফারাক কিছু আছে। সমীক্ষায় এটা প্রমাণিত হয়েছে যেসব মায়েরা এসব বিজ্ঞাপন দেখেছেন শিশুকে বোতলের দুধ খাওয়ানোর প্রবণতা তাঁদের ক্ষেত্রে অন্যদের চাইতে দ্বিগুণ। আর এটা ভয়ানক ব্যাপার, কেননা আমাদের দেশে বোতলের দুধ থেকে রোগ হয়, অপুষ্টি হয়।

অনেকেই বুঝতে পারেন না বোতলের দুধ থেকে কি করে রোগ বা অপুষ্টি হতে পারে? আমাদের দেশের অধিকাংশ পরিবারের যা রোজগার, তার তুলনায় বোতলের দুধে মোট খরচ অনেক বেশি। আমাদের সাধারণ পরিবারগুলিতে যদি একজন বাচ্চাকে বোতলের দুধ ঠিকঠাক খাওয়াতে হয়, তাহলে পরিবারের অন্য ছোটবড় সদস্যের পুষ্টিকর খাদ্য জোটানো অসম্ভব। অন্যদিকে এক কৌটো 'দামী' দুধ বেশিদিন চালানোর জন্য মায়েরা দুধটা পাতলা করে গুলে খাওয়ান। একদিকে পাতলা জলের মতো দুধ দিয়ে পেট ভরানো, অন্যদিকে বাচ্চা মায়ের দুধ টানতে চাইছে না— অপুষ্টি অবধারিত।

আর একটা খরচ আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়। মায়ের বুকের দুধ নিখরচায় জীবাণুমুক্ত, আর বেবি ফুড গোলার জন্য জলকে জীবাণুমুক্ত করতে গেলে কুড়ি মিনিট ফোটাতে হবে। ফোটাতে হবে বোতলগুলো, হাত ধুতে হবে খুব ভালো করে। তারপর নানান নিয়মবিধি মেনে কৌটোর দুধ গুললে তবে বাচ্চার পেটে জীবাণু ঢুকবে না। আমাদের দেশে ক'টা পরিবার জ্বালানির পেছনে এতো অর্থ ব্যয় করতে পারেন? নিয়মবিধি শেখার মানসিকতা, ধৈর্য ও প্রত্যেকবার দুধ তৈরি করার জন্য যে সময় ব্যয় করতে হয়— সেসবের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। ফলে বাচ্চার বোতলে জীবাণু থেকে যায়, বাচ্চার নানা সংক্রমণ হয়, পেটের গোলযোগ হয়, খিদে কমে যায়— ফল অপুষ্টি।

বেবি ফুড কোম্পানিরা এসব কথা জানে না তা নয়। কিন্তু তবু তারা নানা উপায়ে তাদের জিনিস বেচার চেষ্টা করে।

আপনি কি কিছুই করতে পারেন না?

সমাজের সদস্য হিসেবে আপনি করতে পারেন অনেক কিছুই। কোনো পরিবারে একটি নবজাতক শিশু কাঁদলে বাড়ির বড় কেউ হয়তো শিশুর মাকে বলেন— 'আরে দেখছো না বাচ্চা খিদেয় কাঁদছে?

> আমাদের দেশে শিশুর জন্য ফর্মূলা-ফুড তথা বেবি ফুডের বিজ্ঞাপন বেআইনি। কিন্তু বাজার-দখলের নানা কায়দা আছে।

তোমার বুকে যথেষ্ট দুধ নেই। অন্য দুধ দিতে হবে— গরুর দুধ বা কৌটোর দুধ।' এরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হতেই পারেন আপনি, কেননা এদেশে এ ঘটনা প্রাত্যহিক ব্যাপার। সদ্য-মা তখন ক্লান্ত, কিংকর্তব্যবিমূঢ়, আর বাচ্চার ভালোমন্দ নিয়ে চিন্তার চাপে মানসিকভাবে দুর্বল। তিনি ভাবেন কিছু একটা করতে হবে, আর বাড়ির বড়রা অভিজ্ঞজন যখন বলছেন। হ্যাঁ, ডাক্তার আর স্বাস্থ্যকর্মীরা পইপই করে বলেছেন বটে বুকের দুধ যথেষ্ট, কিন্তু তাঁরা তো এখন বাচ্চাকে সামলাতে সাহায্য করবেন না। সুতরাং বাচ্চার মুখে বোতলের নিপল ঢোকে—এবং বাচ্চাটির কান্না থেমে যায়। অতএব এতদ্বারা প্রমাণিত হইল বাচ্চাটির খিদে লেগেছিল, আর বোতল ছাড়া তার খিদে মিটবে না।

মা বাবা পরিবারের অন্যরা যে কথাটা তলিয়ে ভাবেন না—বাচ্চা কিন্তু খিদে পাওয়া ছাড়াও অজস্র কারণে কাঁদে। আবার মায়ের দুধে বাচ্চার পেট পুরো না ভরারও অনেক কারণ থাকতে পারে—হয়তো মা বাচ্চাকে কিভাবে ধরে বুকের দুধ খাওয়াতে হয় সেটা ভুল জানেন, আর স্বাস্থ্যকর্মীও তাঁকে ঠিকভাবে শেখাননি, ফলে বাচ্চা বুকের দুধ পুরো খেতে পারছে না। তার মানে এই নয় যে বুকের দুধ কম আছে। আপনি যদি এরকম পরিস্থিতিতে উপস্থিত থাকেন তো বাচ্চার মাকে আর পরিবারের সবাইকে বুঝিয়ে বলতে পারেন

বাচ্চার বোতলে জীবাণু থেকে যায়, বাচ্চার নানা সংক্রমণ হয়, পেটের গোলযোগ হয়, খিদে কমে যায়— ফল অপুষ্টি।

যাতে বাড়িতে বোতল ঢোকার ব্যাপারটি গোড়াতেই আটকানো যায়।

কিছু প্রশ্ন

বাজারে তো অজস্র ওষুধ আছে, অজস্র 'সাপ্লিমেন্ট' আছে, আপনার কোনো সমস্যা হলেই কি আপনি এদের একে একে ব্যবহার করে দেখেন সমস্যা সেরে গেল কিনা?

আমাদের শরীরে ইনসুলিন তৈরি হয়। আপনার যদি একবার 'মনে হয়' শরীর যথেষ্ট ইনসুলিন তৈরি করছে না, আপনি ওষুধের দোকান থেকে ইনসুলিন কিনে নিজের শরীরে সেটার ইঞ্জেকশন দেওয়া শুরু করবেন কি?

যদি আপনার মনে হয় আপনার বাচ্চা ঠিকঠাক বাড়ছে না, তো আপনি কি দোকানে গিয়ে 'গ্রোথ হরমোন' ইঞ্জেকশন নিয়ে বাচ্চাকে দেবেন?

কিম্বা উচ্চ-রক্তচাপ কমানোর ওষুধ আপনি খেয়ে দেখবেন নাকি নিজের খুশি মত— আরে দেখিই না আর একটু সুস্থ হই কিনা!

না, আমি জানি এগুলোর কোনোটাই আপনি করবেন না। যদি আপনি মোটের ওপর ঠিক থাকেন, আপনি জানেন আপনার শরীর আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু নিজেই বানিয়ে নিচ্ছে। আর অসুস্থ হলে? ডাক্তারের কাছে গিয়ে তার পরামর্শমাফিক ওষুধই আপনি খাবেন।

সুতরাং আপনার কাছে দুটি প্রশ্ন—

১. যে কোনও কায়দায় বেবি ফুডের বিজ্ঞাপন দেখলে আপনি কি ভাববেন? কি করবেন?

২. সদ্যজাত শিশুর ঠাকুমা যখন তাঁর নাতির কান্না শুনে বলবেন, 'বৌমা, তুমি ওকে অন্য দুধ দাও'— তখন আপনি কি বলবেন?

লেখক পরিচিতি: ডা. নীনা ঘোষ, এম বি বি এস, ডি সি এইচ, ডি এন বি, শিশুরোগবিশেষজ্ঞ। কলকাতার একটি বেসরকারি পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটে শিশুরোগ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক।

With Best Compliments from

REMEDY MEDICAL SERVICES LTD.

REMEDY DIAGONSTICS

TRIBENI APARTMENT
Garia Main Road
Kolkata - 700084
Near Kavi Nazrul Metro Station

Tel : 24351057, 24356479

সাক্ষ্য-প্রমাণ নির্ভর প্র্যাকটিস

'সাক্ষ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক মেডিসিন' (Evidence Based Medicine বা EBM) নিয়ে এদেশের অনেক ডাক্তারেরাও এখনও কিঞ্চিত ধন্দে আছেন। তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। পাশ্চাত্য তথা আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যা তো মনগড়া কিছু ব্যাপার নয়, তা 'সাক্ষ্য-প্রমাণ'-এর ওপর ভিত্তি করেই রচিত। হঠাৎ করে বিংশ শতকের একদম শেষের দিকে যখন 'সাক্ষ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক মেডিসিন' তথা EBM নামটি জার্নালে সেমিনারে আসতে থাকল, অনেকেই ভাবলেন— এ আবার নতুন কি? তারপরে যখন 'সাক্ষ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক প্র্যাকটিস' (Evidence Based Medicine or EBP) এল তখনও আমাদের অনেকেরই মনে হল, এও বোধহয় নতুন বোতলে পুরোনো মদ। যে বিষয়টি আমাদের অনেকেরই নজর এড়িয়ে গেল তা হল, আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রে সাক্ষ্য-প্রমাণকে বহুদিন যাবত খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকলেও, বিভিন্ন ধরনের সাক্ষ্য-প্রমাণের মধ্যে কোনটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ, কোনটার ওপর কতখানি ভরসা করা যায়— এই ব্যাপারটা কিন্তু পরিষ্কার ছিল না। এমনকি কোনো ডাক্তার যদি মনে করতেন, তাঁর রোগীকে সবচেয়ে প্রমাণিত চিকিৎসাপ্রণালী অনুযায়ী চিকিৎসা করবেন, তাঁর পক্ষে সেই চিকিৎসাপ্রণালী খুঁজে বের করাটা প্রায় অসম্ভব ছিল। তাই বিভিন্ন সময়ে অনেক অকেজো চিকিৎসা চালু হয়ে উঠেছিল— রোগীদের জন্য তার ফল যে ভালো হয়নি সে কথা বলাই বাহুল্য। অনেক বড় হাসপাতাল আর গবেষণাগারের দিকপাল চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের হাত ধরে আধুনিক 'সাক্ষ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক মেডিসিন' গড়ে উঠেছে। তার মধ্যে আবার কানাডার ম্যাকমাস্টার ইউনিভার্সিটির চিকিৎসকরাই আজ থেকে বছর কুড়ি আগে প্রথম 'সাক্ষ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক মেডিসিন' এই শব্দবন্ধ ব্যবহার করেন, আর সেটার সংজ্ঞা দেন। সেই ম্যাকমাস্টার ইউনিভার্সিটির ডাক্তার **তাপস মন্ডল** ও ছাত্র **চেতন গোহাল** এবারে স্বাস্থ্যের বৃত্তে-র পাঠকদের জন্য কলম ধরেছেন। এবারে তাঁদের লেখার প্রথম পর্ব।

'ইন্টারন্যাল ম্যামারি আর্টারি'-র নাম শুনেছেন? না শুনে থাকলেও ক্ষতি নেই। হার্টের রোগের কথা শুনেছেন তো? হার্টের সেই যে রোগ, যাতে বুকে ব্যথা হয়, আর ই সি জি করে দেখা যায় হার্ট তথা হৃদযন্ত্র অক্সিজেনের অভাবে ভুগছে। তারপর আজকাল এসেছে অ্যাঞ্জিওগ্রাফি, যাতে দেখা যায় হৃদযন্ত্রকে রক্ত সরবরাহ করে যেসব আর্টারি তাদের রোগ হয়েছে, তারা সরু হয়ে গেছে, ফলে হৃদযন্ত্রকে যথেষ্ট পরিমাণে রক্ত সরবরাহ করতে পারছে না। আর্টারিকে বাংলায় বলে ধমনী, যদিও নামটা আক্ষরিক অর্থে বেঠিক, তবু ওটাই চলে বলে আমরাও ধমনী বলব। এইবার যদি কোনও সময়ে হৃদযন্ত্রের কোনও অংশে রক্ত সরবরাহ এতোটাই কমে যায় যে হৃদযন্ত্রের পেশী, যাকে বলে হৃদপেশী, তারা মারা যাচ্ছে, তবে বুকে খুব ব্যথা হয়; ডাক্তার বাবু গম্ভীর মুখে বলেন, 'হার্ট অ্যাটাক হয়েছে, প্রাণ নিয়ে টানাটানি'। হৃদপেশী যদিও হৃৎপিন্ডের ভিতরকার রক্তের খুব কাছাকাছি থাকে, তারা সেই রক্তের থেকে অক্সিজেন নিয়ে নিজের প্রয়োজন মেটাতে পারে না, তাদের জন্য আলাদা যেসব ধমনী আছে, সেই সব হৃদ-ধমনীর মধ্যেকার রক্ত থেকে তাদের অক্সিজেন সরবরাহ হয়। আর সেই সব হৃদ-ধমনী যখন সরু হয়ে যায় তখন অক্সিজেনের অভাবে বুকে ব্যথা হয়, এবং অক্সিজেনের বাড়াবাড়ি রকমের অভাবে হৃদপেশীর মৃত্যু হয়; তাকেই আমরা বলি হার্ট অ্যাটাক।

১৯৩৯ সালে হার্ট অ্যাটাক আটকানোর জন্য একটা অপারেশন শুরু হল— ইন্টারন্যাল ম্যামারি আর্টারি লাইগেশন। সেই ইন্টারন্যাল ম্যামারি আর্টারি দিয়েই আমাদের নিবন্ধ শুরু। এই ধমনীটি 'লাইগেশন' করলে, অর্থাৎ বেঁধে দিয়ে তার মধ্যে রক্ত চলাচল বন্ধ করে দিলে, তেমন কিছু ক্ষতি নেই। ঠিক যেমন গলব্লাডার বা পিত্তথলি আমাদের কাজের জিনিস হলেও তাকে কেটে বাদ দিলে বিশেষ ক্ষতি নেই, সেইরকম। ডাক্তারেরা ধারণা করলেন, ইন্টারন্যাল ম্যামারি ধমনী দিয়ে যে রক্ত আসে, ওই ধমনী বন্ধ করে দিলে সেই রক্তের অনেকটা হৃদ-ধমনী দিয়ে প্রবাহিত হয়ে হৃৎপেশীকে সরবরাহ করার কাজে ব্যবহৃত হবে। অনেকটা একটি নদীর দুই শাখানদীর একটি বাঁধ দিয়ে আটকে দিলে অন্য শাখাটিতে যেমন জল বেশী পরিমাণে বয়ে যায়, সেরকম।

অপারেশন চালু হল, এবং বহু মানুষ, অপারেশনের আগে যাঁদের হৃদযন্ত্রে রক্ত চলাচল কমে গিয়ে বুকে ব্যথা হত, তাঁরা জানালেন তাঁরা অপারেশনের ফলে ভাল আছেন; তাঁদের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেও দেখা গেল যে তাঁদের আগের মতো সহজে বুকে ব্যথা হচ্ছে না। কিন্তু নানা কারণে অপারেশনটির কার্যকারিতা নিয়ে কিছু গবেষকের মনে সন্দেহ দেখা দিল। তখন একটা অদ্ভুত পরীক্ষা করা হল। কয়েকজন হৃদ-রোগীকে নিয়ে দুটো দলে ভাগ করা হল, যাতে দুদলের সদস্যরা মোটামুটি একই বয়সী হন এবং তাঁদের হৃদ-ধমনীর রোগ একই রকমের তীব্র হয়। এবার তাঁদের একদলের ওপর 'সত্যি অপারেশন' করা হল, অর্থাৎ তাঁদের বুক কেটে ইন্টারন্যাল ম্যামারি ধমনী বেঁধে দেওয়া হল। অন্য দলের রোগীদের ওপর 'মিথ্যে অপারেশন' করা হল, অর্থাৎ তাঁদের বুকের ওপর কাটাকুটি করা হল ঠিকই, কিন্তু ইন্টারন্যাল ম্যামারি ধমনীটিকে স্পর্শও করা হল না। রোগীরা জানতেও পারলেন না তাঁদের 'মিথ্যে অপারেশন' হয়েছে; তাঁদের খাওয়া-দাওয়া-ব্যায়াম-বিশ্রাম ইত্যাদি সম্পর্কে উপদেশ, অ্যানাস্থেসিয়া, অপারেশন, হাসপাতালে যত্নআত্তি এসবেতে 'সত্যি অপারেশন' রোগীদের সঙ্গে কোনো ফারাক রাখা হল না। তারপর তাঁদের বেশ কিছুদিন ধরে দেখা হল, প্রশ্ন করে জানা হল তাঁরা কেমন আছেন, নানা পরীক্ষা করে তাঁদের হৃদযন্ত্রের অবস্থা জানার চেষ্টা করা হল। দেখা গেল 'সত্যি অপারেশন' করা হোক আর 'মিথ্যে

অপারেশন' দুদলের রোগীর উন্নতি মোটামুটি সমান! তার মানে অপারেশনের ফলে যা লাভ হয়েছে বলে ভাবা গেছিল সবই ভুয়ো!! ১৯৩৯ সালে অপারেশন শুরু হয়েছিল আর বিশ বছর পরে বলা হল, না, যা করেছি সব মিছে, মায়া, মরীচিকা! কিন্তু ইতোমধ্যে জীবন গিয়েছে চলে আমাদের কুড়ি কুড়ি বছরের পার!

প্ল্যাসিবো ক্রিয়া ঃ

আসলে অপারেশন করার সাথে সাথে অনেক কিছু ঘটনা ঘটে যা প্রত্যক্ষভাবে সেই অপারেশনের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। যেমন এইসব রোগীদের কি খাওয়া উচিত সে ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল, ব্যায়াম করতে বলা হয়েছিল। ঠিকঠাক খাবার আর ব্যায়াম হার্টের রোগীর অসুখের উন্নতি ঘটায়, আর হার্ট অপারেশান করার মতো জীবনের এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যে রোগী যাচ্ছেন তিনি সাধারণত এই ডাক্তারি পরামর্শ বেশ গুরুত্ব দিয়েই মানেন। ফলত অপারেশন কাজের হোক আর অকাজের, রোগীর কিছু উন্নতি হয়, এবং ধরে নেওয়া হয় যেহেতু অপারেশনের পরেই উন্নতি ঘটল, সুতরাং উন্নতির কারণ ওই অপারেশনটি। আরও একটা ব্যাপার ঘটে— তাকে ইংরাজিতে বলে প্ল্যাসিবো এফেক্ট, বাংলায় আমরা 'রোগীতোষ ক্রিয়া' বলতে পারি। এই পরিঘটনাটি আমাদের কাছে অপরিচিত, তাই এই নিয়ে দু-চার কথা বলতে হবে।

যেকোনো ওষুধ বা চিকিৎসা, রোগের উপর তার কোনো শারীরবৃত্তীয় প্রভাব থাকুক বা না থাকুক, সেটা রোগীকে সাহায্য করতে পারে। এর পুরো কারণ আমাদের জানা নেই, কিন্তু মোটের ওপর ধারণা করা হয় যে রোগী চিকিৎসকের চিকিৎসা-প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে প্রভাবিত হয়, বোধকরি সে মনে জোর পায়। শরীর-মন-পরিবেশ এদের জটিল আন্তর্সম্পর্কের ফলে এটা ঘটে। কারণ নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে, কিন্তু প্ল্যাসিবো এফেক্ট বা 'রোগীতোষ ক্রিয়া' পরিঘটনা যে ঘটে সে ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই। প্ল্যাসিবো এফেক্ট-এর ব্যাপারটা এমনিতে ভালো, রোগীকে সুস্থ হতে সাহায্য করে। কিন্তু সমস্যা বাঁধে যখন আমরা কোনো চিকিৎসাতে কতটা কাজ হল সেটা মাপতে যাই, বা আদৌ কাজ হল কিনা সেটা দেখতে যাই।

এসব কারণে আজকাল কোনো চিকিৎসার পরে রোগী ভালো হয়ে গেলে চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা ধরে নেন না যে ওই চিকিৎসার ফলেই রোগীর উন্নতির পুরোটা ঘটেছে। উল্টোদিকে, কোনো চিকিৎসার পরে রোগী খারাপ হয়ে গেলে ধরে নেওয়া হয় না যে ওই চিকিৎসার ফলেই রোগীর সব অবনতি হয়েছে। কেননা যেকোনো পরিস্থিতিতে রোগী কোনো ওষুধের ক্রিয়া-পার্শ্বক্রিয়া ছাড়াও আরও পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের সম্মুখীন হন। যেমন ধরুন একই রোগের দুই রোগীর চিকিৎসা চলাকালীন একজনের চাকরি নট হয়ে গেল, আর একজন লটারিতে কোটি টাকা পেলেন। হয়তো বিমর্ষতার কারণে প্রথমজনের রোগ বেড়ে যাবে, এবং আনন্দে দ্বিতীয়জনের রোগ তাড়াতাড়ি সেরে যাবে। কিম্বা চিকিৎসা চলতে চলতে প্রথমজন খবর পেলেন ওই চিকিৎসায় তাঁর প্রিয় এক বন্ধু মারা গেছেন, তখন তাঁর উপর নোসিবো এফেক্ট (Nocebo Effect) হল, যা প্লাসিবো এফেক্ট-এর ঠিক উল্টো, ফলে তাঁর রোগ সারার বদলে বেড়ে গেল। অন্যদিকে চিকিৎসা চলাকালীন দ্বিতীয়জন খবর পেলেন ওই চিকিৎসায় তাঁর এক প্রিয় বন্ধু সেরে গেছেন, তখন তাঁর ওপর হল প্ল্যাসিবো এফেক্ট, ফলে তাঁর রোগ দ্রুত সেরে গেল। এই উদাহরণ অনেকটাই অতিসরলীকরণ, কেননা অতি ছোটো শিশুদের চিকিৎসাতেও প্ল্যাসিবো এফেক্ট দেখা গেছে। কিন্তু এই উদাহরণ আপাতত আমাদের পক্ষে যথেষ্ট, কারণ একই রোগের একই চিকিৎসায় ফললাভে পরিবেশের প্রভাব, এবং প্ল্যাসিবো এফেক্ট ও তার বিপরীত নোসিবো এফেক্ট সম্পর্কে আমাদের কাজ চালানো গোছের ধারণা এ দিয়েই হয়ে যাবে।

ওষুধের ট্রায়ালে আধুনিক পদ্ধতি ঃ

এখন এই যে আমরা বুঝতে পারলাম যে একটা রোগ বিভিন্ন কারণে ওষুধের (বা অপারেশন, বা অন্য চিকিৎসার) পরে সেরে যেতে পারে, অথবা বেড়ে যেতে পারে এবং তাতে সেই ওষুধ বা অপারেশনের সরাসরি ভূমিকা না-ও থাকতে পারে, তাতে আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পদ্ধতিটা অনেক বদলে ফেলতে হল। আগেকার দিনের মতো 'কুইনিন খাইয়ে পাঁচজন ডাক্তার দেখেছেন ম্যালেরিয়ার জ্বর কমে, অতএব ম্যালেরিয়া জ্বরে কুইনিন দেওয়াই ঠিক'— এমন চটজলদি সিদ্ধান্তে আমরা এখন আর আসতে পারি না। এখন কোনো ওষুধকে ম্যালেরিয়া জ্বরে কার্যকর বলার আগে আমাদের বেশ গুছিয়ে পরীক্ষা করতে হয়। ম্যালেরিয়া জ্বরে কুইনিন কাজ করে কিনা জানার জন্য একশজন ম্যালেরিয়া রোগীকে কুইনিন খাইয়ে দেখতে হয়, আর একশজন রোগীকে কুইনিন না খাইয়ে (কিন্তু অন্য যত্নআত্তি একই রকমভাবে করে) দেখতে হয়। একশজন রোগী বললাম ওটা একটা কথার কথা, পরিসংখ্যান (স্ট্যাটিস্টিক্স) শাস্ত্রের নিয়ম মেনে ঠিক করা হয় কতজন রোগীকে নিয়ে পরীক্ষা করা দরকার। কিন্তু যেটা বললাম, দুদল রোগীর মধ্যে একদল যে ওষুধ নিয়ে বিচার করা হচ্ছে সেটা পাবে, অন্যদল সে ওষুধটা পাবে না, কিন্তু তাছাড়া দুদল অন্য ব্যাপারগুলো মোটের ওপর একই থাকতে হবে। আসলে পরীক্ষার শুরুতেই দুশ রোগীকে নিয়ে তাদের দুভাগে এমনভাবে (র‍্যান্ডম ভাবে) ভাগ করা হয় যেকোনো একজন রোগীর কুইনিন পাবার দলে যাবার সম্ভাবনা যতটা কুইনিন না-পাবার দলে যাবার সম্ভাবনা ঠিক ততটাই। র‍্যান্ডম ভাবে ভাগ করার ফলে দুদলের রোগীর সাধারণ চরিত্র, যেমন রোগীর বয়স, রোগের প্রাবল্য ইত্যাদি একই রকম হয়ে যায়। দুদলের রোগীর রোগের প্রাবল্য একই রকম হবে, তাদের সাধারণ স্বাস্থ্য, বয়স, ছেলে/মেয়ের আপেক্ষিক অনুপাত—এরকম অনেক কিছুই একই রকম হবে, এবং তাদের যত্নআত্তি একই রকম হবে; শুধু একদল কুইনিন পাবে, আর অন্যদল কুইনিনের মতো আর সেরকম তেতো কোনো 'ওষুধ' (ধরুন নিমপাতার বড়ি) পাবে। এই পরীক্ষার ক্ষেত্রে নিমপাতার বড়িটা হল 'প্ল্যাসিবো', অবশ্য প্ল্যাসিবো বলে ঘোষণা করার আগে দেখে নিতে হবে নিমপাতার বড়ির ম্যালেরিয়া রোগ সারানোর ক্ষমতা নেই, আবার রোগীর শারীরিক ক্ষতি করার ক্ষমতাও নেই। রোগী কিন্তু জানবেন না তিনি কোন দলে আছেন, কুইনিন পাবার দলে না কুইনিন না- পাবার দলে। তাঁদের রোগলক্ষণ, তাঁদের রক্তের রিপোর্ট ইত্যাদি নথিবদ্ধ করবেন একদল

ডাক্তার, তাঁরাও কিন্তু জানবেন না একজন বিশেষ রোগী ঠিক কোন দলে। তারপর একটা পূর্বনির্ধারিত সময়ের শেষে (ধরুন চার সপ্তাহের শেষে) কোন রোগীর রোগ কেমন আছে, সেরে গেছে না বেড়ে গেছে সেটা খতিয়ে দেখা হবে; যাঁরা খতিয়ে দেখবেন তাঁরাও কিন্তু জানবেন না কোন রোগী কুইনিন পেয়েছেন আর কোন রোগী তা পান নি। এই সব তথ্য নথিভুক্ত হবার পর সেগুলো নিয়ে বিশ্লেষণ করা হবে, দেখা হবে কুইনিন পাওয়া রোগীরা 'মোটের ওপর' কুইনিন না-পাওয়া রোগীদের চাইতে ভালো হয়ে উঠছেন কিনা। ওই যে 'মোটের ওপর' কথাটা বললাম, ওটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা। কেননা চিকিৎসাশাস্ত্র সেই গোষ্ঠীর বিজ্ঞান যাদের সিদ্ধান্ত নিষ্পত্তিকর (Deterministic) না হয়ে কেবল সম্ভাবনাসূচক (Probabilistic)-ই হতে পারে; ঠিক যেমন আবহাওয়া বিজ্ঞান। তথ্য বিশ্লেষণ করে যদি দেখা যায় কুইনিন পাওয়া রোগীরা 'মোটের ওপর' অপেক্ষাকৃত ভাল হয়ে উঠছেন তবেই আমরা বলতে পারি যে ম্যালেরিয়া রোগে কুইনিন কার্যকর।

এই গোটা পরীক্ষা ও তার ফলাফল নিয়ে পরিসংখ্যানশাস্ত্র-সম্মত চর্চা, একে আমরা বলি Randomized Controlled Trial (RCT)। দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হল এ-কথাটার কোন সর্বজনগ্রাহ্য বাংলা প্রতিশব্দ নেই, সুতরাং আমরা একে 'আর সি টি' (RCT) বলেই অভিহিত করব। এই ট্রায়ালে অংশগ্রহণকারী রোগী বা তাঁদের চিকিৎসার সঙ্গে সরাসরিভাবে যুক্ত চিকিৎসকেরা জানতে পারলেন না যে কোন রোগী ওষুধ পেয়েছেন আর কোন রোগী পান নি, তাই এঁদের দু'দলই রোগীর ওষুধ পাওয়া সম্পর্কে অন্ধ। আমরা দুদলের এই ধরনের ইচ্ছাকৃত অজ্ঞতাকে বলব Double Blind পদ্ধতি, তখন পুরো পদ্ধতির নাম দাঁড়াবে Double Blind Randomized Controlled Trial (RCT), বাংলায় বলব 'দুই-অন্ধ আর সি টি'। বর্তমানে কোনো ওষুধ বা পদ্ধতির কার্যকারিতা প্রমাণে 'দুই-অন্ধ আর সি টি' হল সবচেয়ে সমাদৃত পদ্ধতি, যদিও সবক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা যায় না; সে কথায় আমরা যথাসময়ে আসব। তবে একটা কথা এখানে বলে রাখি। 'দুই-অন্ধ আর সি টি' বলুন বা এই জাতীয় অন্য কোন পরিসংখ্যান- শাস্ত্রসম্মত পদ্ধতি— আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রই কেবল এগুলি গ্রহণ করেছে, 'বিকল্প চিকিৎসা- পদ্ধতি' হোমিওপ্যাথি বা আকুপাংচার কিন্তু এই পদ্ধতি মেনে তাদের চিকিৎসার কার্যকারিতা বিচার করে না।

এইবার আমরা 'সাক্ষ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক প্র্যাকটিস' (Evidence Based Practice or EBP) বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করতে চাইব। অবশ্য 'সাক্ষ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক মেডিসিন' (Evidence Based Medicine or EBM) কথাটাই যদিও বেশি পরিচিত, 'সাক্ষ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক প্র্যাকটিস'-এর প্রয়োগক্ষেত্র আরও বৃহৎ। বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে সাক্ষ্য-প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে, এখানে যে চিকিৎসা কাজে লাগে বলে প্রমাণ পাওয়া যায় নি, তাকে বিদায় করা হয়েছে। এইভাবেই এককালে রক্ত-মোক্ষণ নানা রোগের চিকিৎসায় অত্যন্ত সাফল্যজনক বলে ভাবা হত, বড় বড় ডাক্তার তার পক্ষে ছিলেন, কিন্তু যখন পরীক্ষায় দেখা গেল রক্ত-মোক্ষণ মোটেও রোগীকে ভালো করে না, তখন দ্রুতবেগে সেই পদ্ধতিটি বিদায় নিল। সেটা ঊনবিংশ শতকের কথা। কিন্তু 'সাক্ষ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক মেডিসিন' কথাটা এসেছে অনেক অনেক পরে। আমরা দুজন এখন যেখানে কাজ করি সেই ম্যাকমাস্টার ইউনিভার্সিটিতে ডেভিড স্যাকেট আর গর্ডন গুয়েট-এর টিম আজ থেকে কুড়ি বছর আগে প্রথম এই শব্দবন্ধ ব্যবহার করেন, সেটা তাঁদের হাতেই প্রথম সংজ্ঞায়িত হয়। আমরা সে কথায় পরে আবার আসব।

খানিক তত্ত্বকথা ঃ

চিকিৎসাশাস্ত্রের অন্দরমহলে সতত পরিবর্তন ও উন্নতি ঘটে চলেছে, আর রোগীরা যাতে ঠিক চিকিৎসা পান তার জন্য সাক্ষ্য-প্রমাণের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। নেহাতই আন্দাজি চিকিৎসা থেকে সত্যিকারের ভাল চিকিৎসায় উত্তরণের জন্য সাক্ষ্য-প্রমাণকেই আঁকড়ে ধরতে হবে। বৈজ্ঞানিক উন্নতির সাথে সাক্ষ্য-প্রমাণের পরিমাণ বাড়বে, আর তার সাথে তাল রেখে চিকিৎসার মানেরও উন্নতি ঘটবে। সেজন্যই সাক্ষ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক প্র্যাকটিস (Evidence Based Practice or EBP) আর তার প্রয়োগ নিয়ে আগ্রহ বাড়ছে। সাক্ষ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক মেডিসিন (Evidence Based Medicine or EBM) কথাটাই যদিও বেশি পরিচিত, সাক্ষ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক প্র্যাকটিসের প্রয়োগক্ষেত্র আরও বৃহৎ, কেননা এরমধ্যে চিকিৎসাশাস্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত নানা বিষয়ে, এমনকি সম্পর্কিত নয় এমন নানা বিষয়েও জ্ঞানের প্রয়োগের ব্যাপারটা রয়েছে। তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা বা রসায়নের মতো বিজ্ঞানের মৌলিক শাখার চর্চা যাঁরা করেন তাঁদেরও নিজক্ষেত্রে বড় মাপের বিজ্ঞানীরা একদা যা বলেছিলেন তাকে সমর্থন করতে বা বিরোধিতা করতে সাক্ষ্য-প্রমাণের শরণ নিতে হয়। যেমন 'বোসন' কণার অস্তিত্ব সম্পর্কে যে বিজ্ঞানী অনুমান করেছিলেন, কণাটিকে খুঁজে পাবার পর তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা তাঁর সময়ের চাইতে ঢের বেশি জটিল ও ইন্টারেস্টিং হয়ে উঠেছে।

সাক্ষ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক প্র্যাকটিস হল সঠিক, সর্বশেষ ও যথাযথ সাক্ষ্য-প্রমাণের সুবিবেচক প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত নেওয়া। এই পদ্ধতির আবিষ্কারকে অনেকে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখেছেন; বিশেষ করে বহু চিকিৎসক মনে করেছেন যে এতে অভিজ্ঞতাকে যথার্থ মূল্য দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু ঘটনা হল সাক্ষ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক প্র্যাকটিসে অভিজ্ঞতাকে বেশ দামি জিনিস বলেই মনে করা হয়; এই ব্যাপারটায় আমরা আবার আসব। সাক্ষ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক প্র্যাকটিসের তিনটি অংশ—(চিকিৎসকের) ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, যে রোগীকে তিনি দেখছেন তার বাইরে নথিভুক্ত সর্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষ্য-প্রমাণ, এবং রোগীর নিজের মূল্যবোধ ও চাহিদা (Sackett et al 1997)। সাক্ষ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক প্র্যাকটিসকে ঠিকভাবে প্রয়োগের জন্য এই তিনটি অংশের প্রতিটিকেই ব্যবহার করতে হবে। বিশেষত চিকিৎসাশাস্ত্রের ক্ষেত্রে এই নতুন পদ্ধতিকে যুক্ত করার ফলে অসংখ্য রোগকে বোঝা ও তাদের চিকিৎসায় ব্যাপক উন্নতি সম্ভব হয়েছে।

সাক্ষ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক প্র্যাকটিসের নানা পদ্ধতি ও প্রকরণ নিয়ে আমরা আলোচনা করব স্বাস্থ্যের বৃত্তে-র পরের সংখ্যায়।

লেখক পরিচিতি: চেতন গোহাল কানাডার ম্যাকমাস্টার ইউনিভার্সিটির হেলথ সায়েন্স-এর লেভেল ২ ছাত্র।
ডা. তাপস মন্ডল ম্যাকমাস্টার ইউনিভার্সিটির শিশুরোগ বিভাগের কার্ডিওলজি ডিভিশনের সহযোগী অধ্যাপক।
অনুবাদ সহায়তা করেছেন ডা. জয়ন্ত দাস, কলকাতার একটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজে সহযোগী অধ্যাপক।

মধুমেহতা

ডায়াবেটিস— এক জীবনযাত্রা-জনিত ব্যাধি। ভারতে এ-রোগের প্রকোপ বাড়ছে হু হু করে। এ-রোগ আমাদের নীরব ঘাতক। চালু রাস্তায় সভ্যতার যে অপবিকাশ হয়ে চলেছে তাকে রোধ করাই ডায়াবেটিসকে আটকানোর প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু তার জন্য রোগটির আনাচ-কানাচ জানা দরকার— লিখছেন **ডা. সিদ্ধার্থ গুপ্ত**।

মধু মেহতা বললে প্রথমেই মনে হবে এ বোধ হয় কোনো গুজরাটি ভদ্রমহিলার নাম। বোধহয় কোনো পারিবারিক গল্প ফেঁদে বসেছি **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**-র পাতায়। তখন যদি বলি এই মধুমেহতা হল বিশ্বের সর্বপ্রধান অসংক্রামক অসুখের নাম, তাহলে কী বলবেন? পাঠকের আর বিরক্তি উৎপাদন না করে স্পষ্ট কথা সোজাসুজি বলা যাক। আমাদের অতি পরিচিত অসুখ ডায়াবেটিস। ডাক্তারি পরিভাষায় ভদ্র নাম হল ডায়াবেটিস মেলিটাস (Diabetes mellitus)— তারই বাংলা পরিভাষা মধুমেহ। সেই মধুমেহ রোগে আক্রান্ত অথবা মধুমেহতায় ভুগছেন এমন মানুষের সংখ্যা কত? ২০১০ সালের পরিসংখ্যান অনুসারে সারা বিশ্বে প্রায় ৩০ কোটি মানুষ এই রোগে ভুগছেন। ভারতবর্ষে প্রায় ৬ কোটি মানুষ এতে আক্রান্ত— বছরে এই অসুখজনিত নানা কারণে মৃত্যুর সংখ্যা ১০ লক্ষেরও বেশি। পরিসংখ্যানবিদদের মতে ভারতবর্ষ বসে আছে ডায়াবেটিসের 'টাইম বোমা'র উপর। ২০৩০ সালে মোট রোগীর সংখ্যা ১০ কোটি ছাড়িয়ে যাবে। আর পৃথিবীতে ২০৩০ সাল নাগাদ প্রায় ৭০ কোটি মানুষ এই রোগে ভুগবেন। সারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানা উন্নয়নশীল দেশ— যারা দশ শতাংশের কাছাকাছি বৃদ্ধির হারে (Growth Rate) পৌঁছাবার জন্য পশ্চিমী বিশ্বায়িত অর্থনীতির পথে প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে, আরও আয় বাড়াতে চাইছে, জাপটে ধরছে নগরায়ন-শপিংমল-মাল্টিপ্লেক্স-জাঙ্কফুড-কোক-পেপসির সংস্কৃতিকে, বাড়ছে মানসিক চাপ সেই সব জায়গাতেই— ডায়াবেটিস বাড়ছে হু হু করে। বিশ্বে অসুস্থতা ও মৃত্যুর এক প্রধান নাম ডায়াবেটিস যা আক্রমণ করে আপনার স্নায়ুতন্ত্র থেকে হৃদপিন্ড ও সংবহনতন্ত্র, রেচনতন্ত্র থেকে চোখ, গায়ের চামড়া থেকে হাত পায়ের স্নায়ু ও পেশি— প্রতিটি প্রত্যঙ্গকেই। এককথায়, 'সব রোগের ধাত্রী'। সেই মধুমেহ নিয়েই আজ আমাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

উৎসের সন্ধানে

মধুমেহতে কী হয়? মূল বিষয়টি অনেকেই জানেন। আমরা যত রকমের খাদ্য গ্রহণ করি শক্তির উৎস হিসাবে—তা মূলত তিন ভাগে বিভক্ত। শর্করা জাতীয় খাদ্য বা কার্বোহাইড্রেট, স্নেহ পদার্থ বা ফ্যাট এবং প্রোটিন। কার্বোহাইড্রেটের আবার নানা প্রকারভেদ। এক অণুবিশিষ্ট কার্বোহাইড্রেটকে বলে মোনোস্যাকারাইড— যার মধ্যে আছে গ্লুকোজ (প্রধানতম উপাদান), ফ্রাকটোজ (মূলত ফলে থাকে), গ্যালাকটোজ (মূলত দুধে থাকে) প্রভৃতি। দ্বি-অণু কার্বোহাইড্রেটের মধ্যে (ডাই স্যাকারাইড) পড়ে— সুক্রোজ, ল্যাকটোজ, মলটোজ ইত্যাদি। এর উপর আছে বহু অণুবিশিষ্ট শর্করা—উদ্ভিদদেহে স্টার্চ (নানা দানাশস্য, আলু ও মাটির তলার ফসল ইত্যাদির মূল উপাদান) এবং প্রাণীদেহে গ্লাইকোজেন (যা মাংসপেশি ও যকৃতে জমা থাকে জরুরি প্রয়োজনের জন্য)। খাদ্যে যে রূপেই থাকুক না কেন, শরীরের মধ্যে সমস্ত শর্করা জাতীয় খাদ্যই শেষ পর্যন্ত গ্লুকোজে (আণবিক ফর্মুলা $C_6H_{12}O_6$) পরিণত হয়। এমনকি অতিরিক্ত পরিমাণ স্নেহ ও প্রোটিন জাতীয় খাদ্যও (যার মূল উপাদান অ্যামিনো অ্যাসিড) থেকে গ্লুকোজ তৈরি হয়। এই গ্লুকোজ জারিত হয়েই আমাদের শরীরের সমস্ত দৈনন্দিন কাজের শক্তি (Energy)-র যোগান আসে।

গ্লুকোজের পরিপাক ও আত্তীকরণের জন্য একান্তই প্রয়োজন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির এক ক্ষরিত রস বা হরমোনের— যার নাম ইনসুলিন। মানবদেহের পেটের মধ্যে একদম পেছনের দিকে আছে অগ্ন্যাশয় (Pancreas)বলে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যঙ্গ। এর সামনের অংশ থেকে নিঃসারিত হয় প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট এবং ফ্যাট পরিপাকের অতি প্রয়োজনীয় প্রায় ছয়রকম উৎসেচক (Enzyme), যা নালীপথে গ্রহণী (Dueodenum) -র মধ্যে এসে পড়ে। অগ্ন্যাশয়ের পিছনের অংশে থাকে নানা অন্তঃক্ষরা (Endocrine) গ্রন্থির সমষ্টি— এককথায় এদের নাম 'ল্যাঙ্গারহানের দ্বীপ'। এর মধ্যে আছে আলফা, বিটা, ডেল্টা প্রভৃতি কোষ। বিটা কোষ থেকে ক্ষরিত হয় ইনসুলিন নামক মহার্ঘ্য রাসায়নিক দ্রব্য—সরাসরি মিশে যায় রক্তস্রোতে। ইনসুলিন একটি দুই শৃঙ্খলবিশিষ্ট প্রোটিন যার গুরুত্ব শরীরে অপরিসীম। নানা দায়দায়িত্ব এই ইনসুলিনের— এককথায় বলা চলে, 'গুণতে গেলে গুণের নাহি শেষ।' তার মধ্যেও এই হরমোনের প্রধান কাজ হল রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা, দেহকলা এবং কোষের মধ্যে রক্তের গ্লুকোজকে ঢুকতে সাহায্য করা, প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্লুকোজকে গ্লাইকোজেনে রূপান্তরিত হতে সাহায্য করা ইত্যাদি। এককথায় রক্তের মধ্যে গ্লুকোজের পরিমাণ যেন স্বাভাবিক মাত্রার থেকে বেশি না হয়ে যায়— কেননা রক্তের অতিরিক্ত গ্লুকোজ তাহলে একদিকে সমস্ত ধমনী, হৃদপিন্ড, বৃক্ক, চোখের রেটিনা, স্নায়ু সর্বত্র জমা পড়ে তাদের ধীরে ধীরে অকেজো করে তুলবে। অন্যদিকে শরীরের যেকোনো সংক্রমণই সহজে সারবে না। সংক্রমণকারী অণুজীবেরা পরম উল্লাসে রক্তের অত্যধিক মাত্রার গ্লুকোজ খেয়ে সানন্দে বংশবৃদ্ধি করবে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে যদি শরীরে ইনসুলিনের অভাব ঘটে বা ইনসুলিন থাকা সত্ত্বেও ঠিকমত কাজ না করে— তাহলে সমূহ বিপদ।

একদিকে আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিকল হয়ে যাবে, অন্যদিকে রক্তে প্রচুর পরিমাণে গ্লুকোজ থাকা সত্বেও তা ইনসুলিনের অভাবে কোষে প্রবেশ করবে না। ফলে শক্তি ও খাদ্যের অভাবে শরীরের কোষ ও কলা ধুঁকে ধুঁকে মরবে। ঠিক সেই The Rime of the Ancient Mariner কবিতার "Water water everywhere,/Nor any drop to drink"— এর মতো! ফলে নানা রোগ। অন্ধত্ব, হার্ট অ্যাটাক, কিডনি ফেলিওর, পক্ষাঘাত, হাতে বা পায়ে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত বা ঘা, নানা ধরনের সংক্রমণ— এবং অবশেষে মৃত্যু! এই হল মধুমেহের গোড়ার কথা।

কথা প্রসঙ্গে বলি ইনসুলিনের এক বৈমাত্রেয় ভাই আছে যা বার হয় পাশের 'আলফা' কোষ থেকে। স্বাভাবিকভাবেই দাদার সাথে তার জন্মশত্রুতা— আদায় কাঁচকলায় সম্পর্ক। তার নাম গ্লুকাগন। এই হরমোনের সবসময় চেষ্টা ইনসুলিনের বিরোধিতা করা, রক্তে চিনির পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া। ফলে অতিরিক্ত গ্লুকাগন ক্ষরণের ফলেও ডায়াবেটিস হতে পারে। এই গ্লুকাগনের পরম বন্ধু আবার কর্টিজল (Cortisol) বা গ্লুকোকর্টিকয়েড হরমোন— যা বার হয় বৃক্কের উপর বসে থাকা অ্যাড্রিন্যাল কর্টেক্স (Adrenal Cortex) নামক অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে। এরও সর্বদা চেষ্টা রক্তে শর্করার পরিমাণ বাড়িয়ে দেবার। ফলে একা ইনসুলিনকে লড়তে হয় এদের সবার সঙ্গেই। তবে ভাগ্য ভাল, ইনসুলিনের ক্ষমতা এদের চেয়ে অনেক বেশি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইনসুলিনেরই জয় হয়। তবে মধুমেহতা আক্রান্ত রোগীদের কথা ভিন্ন।

কয় প্রকার মধুমেহ?

দেহে ইনসুলিনের অভাব ঘটে যদি অগ্ন্যাশয়ের বিটা কোষগুলি ধ্বংস হয়ে যায়। একে বলে প্রথম ধরণের (Type I) বা ইনসুলিন নির্ভর (Insulin Dependent Diabets Mellitus বা IDDM)। অনেকের মতে এটি একটি স্বপ্রতিরোধী (Autoimmune) রোগ— যাতে শরীরের মধ্যেই অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে বিটা কোষগুলি ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু নির্দিষ্ট কারণ জানা নেই। সাধারণত একদম কম বয়স থেকেই এই অসুখ দেখা যায় এবং বয়ঃসন্ধির সময় দারুন ভাবে তা আত্মপ্রকাশ করে। ইনসুলিনের অভাবে দেহে গ্লুকোজ বিপাকের বিপর্যয়ের ফলে তৈরি হয় 'কিটোঅ্যাসিড' নামক অত্যন্ত ক্ষতিকারক পদার্থ। ফলে বাচ্চাটি অচৈতন্য হয়ে পড়তে পারে এবং সেই অবস্থাতেই হাসপাতালে আনলে হয়ত প্রথম বারের মতো ডায়াবেটিস ধরা পড়ে। এই ধরনের রোগীদের সারাজীবনই ইনসুলিন নিয়ে বেঁচে থাকতে হয়।

অপরপক্ষে প্রায় ৯০ % ডায়াবেটিস রোগীর রোগ হল ইনসুলিন অনির্ভর (Non Insulin Dependent)। এদের শরীরে ইনসুলিনের ক্ষরণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে স্বাভাবিকই হয়। কিন্তু কোষে যেসব ইনসুলিন গ্রাহক (receptor) থাকে, তাদের নানা গোলযোগের ফলে কোষ ও কলায় ইনসুলিন ঠিকমত কাজ করতে পারে না। ফলত রক্তে ঐ হরমোন যথেষ্ট পরিমাণে থাকলেও, এমনকি বেশি থাকলেও কাজ লবডঙ্কা। স্থূলত্ব এর একটা কারণ। আরও নানা কারণ আছে। কী কারণে এই ধরণের মধুমেহ হয়, তার সমস্ত বিষয় এখনও পুরোপুরি বোঝা যায় নি। নিচের সারণিতে দু-ধরনের মধুমেহ-র পার্থক্য দেখুন।

	প্রথম প্রকার (Type I)	**দ্বিতীয় প্রকার** (Type II)
১. প্রারম্ভ	আকস্মিক	ক্রমশঃ
২. আরম্ভের বয়স	শৈশব	বয়স্ক (সাধারণতঃ ৪০ বছরের উপর)*
৩. রোগীর চেহারা	স্বাভাবিক বা কৃশকায়	সাধারণত স্থূলকায়।
৪. রক্তে ইনসুলিনের পরিমাণ	খুবই কম বা অনুপস্থিত	স্বাভাবিক, বেশি বা কেনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু কম।
৫. কিটো অ্যাসিডোসিস	খুবই বেশি।	কম।
৬. জিনঘটিত কারণের সম্ভাবনা	খুবই বেশি।	কম। তবে এক্ষেত্রে পরিবারের অনেকের রোগ দেখা যায়
৭. রোগের প্রাদুর্ভাব	১০ %	৯০ %

*একটা কথা এখানে মনে রাখতে হবে। 'উন্নয়নশীল সমাজে' উন্নততর জীবনশৈলীর জন্য দ্বিতীয় ধরনের ডায়াবেটিস আক্রান্ত হবার গড় বয়সও ক্রমশ কমে আসছে। হামেশাই মধ্য বিশ/মধ্য ত্রিশের যুবক যুবতীদেরও মধুমেহ ধরা পড়ছে। এই ধরণের মধুমেহকে বলা হয় MODY (Maturity Onset Diabetes of Young)।

অন্যান্য ধরনের মধুমেহ

১. **গর্ভকালীন মধুমেহ**—প্রায় ২ থেকে ৫ % প্রসূতি মায়েদের গর্ভাবস্থায় গ্লুকোজের বিপাক এবং ইনসুলিন ক্ষরণের বা কার্যকারিতার ত্রুটির জন্য ডায়াবেটিস দেখা যায়। এর মধ্যে ২০ থেকে ৫০ % ক্ষেত্রে গর্ভ অবসানের পরও তা থেকে যেতে পারে এবং পুরোপুরি 'টাইপ টু' অসুখে পরিবর্তিত হতে পারে। বাকি ক্ষেত্রে তা পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়ে যায়। এই ধরনের গর্ভকালীন মধুমেহ অবশ্যই দ্রুত চিহ্নিত করে চিকিৎসা করতে হবে। নচেৎ গর্ভস্থ শিশুর নানা রোগ দেখা দিতে পারে। শিশুটির ওজন বেশি হয়। স্নায়ুতন্ত্র, শ্বাসতন্ত্র, মাংসপেশির রোগ হতে পারে। হৃদপিন্ডের নানা ত্রুটি দেখা দিতে পারে। জন্মের পর দীর্ঘদিন ধরে কামলা রোগ বা জন্ডিসে ভোগারও সম্ভাবনা থাকে।

অন্যান্য কারণে মধুমেহ (Secondary Diabetes)

(ক) অগ্ন্যাশয়ের অসুখ— মূলত অত্যধিক মদ্যপানের ফলে অগ্ন্যাশয়ের দীর্ঘকালীন প্রদাহ (Chronic Pancreatitis)। তাছাড়া যদি কোনো কারণে অগ্ন্যাশয় কেটে বাদ দিতে হয়।

(খ) **অন্যান্য অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির অসুখ—** অতিরিক্ত গ্লুকাগন বা কর্টিজলের ক্ষরণ, থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের অতিরিক্ত ক্ষরণও রক্তে গ্লুকোজ বাড়ায়।

(গ) **'ট্রেস' ডায়াবেটিস—** শরীরের বড় অংশ পুড়ে যাওয়া, হার্ট অ্যাটাক, সারা শরীরে সংক্রমণ (Septicemia)।

(ঘ) **ওষুধ—** স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ। ফ্যাট কমাবার 'স্ট্যাটিন' জাতীয় ওষুধ।

(ঙ) **জন্মগত রোগ—** যাতে শর্করা এবং স্নেহপদার্থের বিপাকে নানা গোলযোগ থাকে।

এছাড়াও আরও বহু কারণ আছে যার ফলে ডায়াবেটিস হতে পারে। কিছু ভাইরাল অসুখের ফলেও মধুমেহ হতে পারে, যেমন কক্সাকি (Coxasckie) ভাইরাস। Latent Autodimmune Diabetes of Adult (LADA) আর একটি অপ্রতুল অসুখ যাতে বয়স্ক মানুষদের টাইপ-১ ডায়াবেটিস হয়। ১৯৯৯ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আর এক ধরনের মধুমেহকে চিহ্নিত করেছেন যার নাম 'অপুষ্টিজনিত মধুমেহ' (Malnutrition Related Diabetes Mellitus বা MRDM)।

উপসর্গ

মধুমেহ-র প্রধান উপসর্গ পাঁচটি—

১। অতিরিক্ত তৃষ্ণা

২। অতিরিক্ত ক্ষুধা

৩। অতিরিক্ত প্রস্রাব

৪। সারা শরীরে চুলকানি

৫। শরীরের কোনো অংশে অসাড়তা বা মাংসপেশির দুর্বলতা।

এই ধরনের এক বা একাধিক উপসর্গ নিয়ে রোগী চিকিৎসকের কাছে আসতে পারেন। তাছাড়া আরও নানা সমস্যা বা বিশেষ কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকলতাও প্রথমবার রোগীকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে আসতে পারে। মনে রাখতে হবে, বহুক্ষেত্রেই মধুমেহ নীরবে শরীরের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে, ক্রমশ বৃদ্ধি পায়— যতক্ষণ না চোখ, কিডনি, স্নায়ুতন্ত্র, হৃদপিন্ড প্রভৃতির কোনো না কোনো গুরুতর বৈকল্য ঘটে। তখন রক্ত পরীক্ষা করে ধরা পড়ে যে রোগী ডায়াবেটিসে ভুগছেন। বহুক্ষেত্রেই জীবন বিমার জন্য বা অন্য কারণে রুটিন রক্তপরীক্ষা করতে গিয়ে ডায়াবেটিস ধরা পড়ে। রোগীর অজান্তেই তখন রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ হয়তো পৌঁছেছে প্রতি ১০০ মিলিলিটারে ৫০০/৬০০ মিলিগ্রাম।

অন্যান্য যেসব উপসর্গ নিয়ে রোগী আসতে পারেন—

১. দুর্বলতা। কাজকর্ম করতে গিয়ে অল্পেই হাঁপিয়ে পড়া বা ক্লান্ত হয়ে পড়া।

২. শরীরের কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অসাড়তা (sensory loss) অথবা মাংসপেশির বৈকল্য (motor loss)।

৩. কিডনির ক্ষতি হওয়ার জন্য হাত পা ফুলে যাওয়া, প্রস্রাব ঠিকমত না হওয়া, রক্তাল্পতা এবং 'রেনাল ফেলিওর'-এর অন্যান্য উপসর্গ।

৪. চোখে অল্প বয়সে ছানি পড়া। দ্রুত চশমার 'পাওয়ার' পাল্টানো এবং ঝাপসা দেখা।

৫. গা বমির ভাব, বমি হওয়া, পেটে যন্ত্রণা।

৬. শরীর ভেঙ্গে যাওয়া, দ্রুত শরীরের ওজন কমে যাওয়া।

৭. পায়ে সামান্য আঘাতের ফলে ক্ষত সৃষ্টি হওয়া এবং সেই ঘা শুকোতে চায় না (Trophic ulcer)। পায়ে গ্রাংগ্রিন হতে পারে। এছাড়াও শরীরের যেকোনো জায়গায় কাটা-ছেঁড়া বা ক্ষত হলে তা শুকোতে দেরি হয়।

৮. ছেলেদের পুরুষত্বহীনতা। মেয়েদের বন্ধ্যাত্ব বা অনিয়মিত মাসিক।

৯. বারে বারে শ্বাসতন্ত্র বা ফুসফুস, রেচনতন্ত্র বা অন্যত্র সংক্রমণ। গায়ে বারে বারে ফোঁড়া হওয়া

এবং চট করে অ্যান্টিবায়োটিকে কাজ না হওয়া।

১০. রোগী প্রথমেই অর্ধচৈতন্য বা সম্পূর্ণ অচৈতন্য অবস্থায় আসতে পারেন। চিকিৎসার ফলে রক্তে শর্করা অস্বাভাবিক কমে গিয়ে (Hypoglycemia) অথবা চিকিৎসা না করার ফলে ভীষণ বেড়ে গিয়ে (Ketoacidotic coma) এরকম অবস্থা হতে পারে। তবে 'হাইপোগ্লাইসেমিক কোমা' অনেক বেশি প্রাণঘাতী। কারণ আমাদের মস্তিষ্কের কোষের একমাত্র শক্তির উৎস গ্লুকোজ— যার অভাবে স্থায়ী বিকলতা ও মৃত্যু ঘটা সম্ভব।

১১. হার্ট অ্যাটাক (ডাক্তারি পরিভাষায় Myocardial Infarction) নিয়েও রোগী আসতে পারেন।

রোগ নির্ণয়

মধুমেহ নির্ণয় করতে গেলে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ মাপতে হবে। এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। ব্রিটেনের ডাক্তারদের সঙ্গে আমেরিকার ডাক্তারদের মেলে না। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-র সাথে মতবিরোধ আমেরিকার মধুমেহ সংগঠনের (American Diabetes Association)। মোটের উপর এখনও পর্যন্ত মধুমেহ নির্ণয়ের জন্য যে মানদন্ড সর্বজনীন ভাবে গৃহীত তা নিচে দিলাম (প্রথমবার রোগ নির্ণয়ের জন্য)।

ক. সারারাত্রি উপবাসের পরে (অন্তত আট ঘন্টা) শিরার রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ—১২৬ মিগ্রা/১০০ মিলি রক্তে— এর বেশি।

খ. ৭৫ গ্রাম (অথবা ১ গ্রাম/কেজি দেহের ওজনের) গ্লুকোজ খাবার দু ঘন্টা পরে শিরার রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ—২০০ মিগ্রা/১০০ মিলি রক্তে— এর বেশি।

গ. মধুমেহের একাধিক উপসর্গ আছে এবং যেকোনো সময়ে শিরার রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ—২০০ মিগ্রা/১০০ মিলি রক্তে— এর বেশি।

ঘ. গ্লুকোজ যুক্ত হিমোগ্লোবিন বা গ্লাইকোসাইলেটেড হিমোগ্লোবিন (HbA_1C)-র পরিমাণ—৬.৫ %-এর বেশি।

অনেকেই আবার গ্লাইকোসাইলেটেড হিমগ্লোবিনের মাত্রাকে বেশি গুরুত্ব দেন, কেননা এই মাত্রা অন্তত তিনমাস ধরে গড় রক্ত শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ছিল কিনা তার পরিচয় দেয়।

পরের পাতার সারণি দেখুন

উপরের সারণিতে 'খ' গোষ্ঠির মানুষদের ক্ষেত্রে পরামর্শ হল শর্করা জাতীয় খাদ্য যথাসম্ভব কম খাওয়া, নিয়মিত হাঁটা বা ব্যায়াম করা এবং প্রতি

	উপবাসের পর রক্তে শর্করা	৭৫ গ্রাম গ্লুকোজ খাবার পর রক্তে শর্করা	গ্লাইকোসাইলেটেড হিমোগ্লোবিন (HbA_1C
ক. মধুমেহ নেই	<১০০ মিগ্রা/ ১০০ মিলি	<১৪০ মিগ্রা/১০০ মিলি	<৬.০ %
খ. গ্লুকোজের বিপাকে ত্রুটি আছে (Impired Glucose Tolerance)	১১০-১২৫ মিগ্রা/ ১০০ মিলি	১৪০-২০০ মিগ্রা/ ১০০ মিলি	৬.০-৬.৪ %
গ. মধুমেহ	>১২৬ মিগ্রা/ ১০০ মিলি	>২০০ মিগ্রা/১০০ মিলি	>৬.৫ %

ছয়মাস অন্তর রক্ত পরীক্ষা করানো। এঁদের মধ্যে অনেকেই কালক্রমে পুরোপুরি মধুমেহতায় আক্রান্ত হন। তখন তার চিকিৎসা করতে হবে।

রক্তে শর্করার পরিমাণ ১৮০ মিগ্রা/১০০ মিলি তে ছাড়িয়ে গেলে তা প্রস্রাবেও বার হয় এবং পরীক্ষায় ধরা পড়ে। ডায়াবেটিসের রোগীরা এ পরীক্ষা নিজেদের বাড়িতে করেই কিছুটা ধারণা করতে পারেন। তবে তা কখনও রক্ত পরীক্ষার বিকল্প নয়। কেননা—

১। অনেক ক্ষেত্রেই রক্তে আরও কম মাত্রাতেই প্রস্রাবে গ্লুকোজ বার হয়ে আসে। একে বলে Renal Glycosuria। এটা কোনো অসুখ নয়।

২। দীর্ঘকালীন রোগের ফলে কিডনি জখম হলে, প্রস্রাবে গ্লুকোজ বার হওয়া কমে যায়। অনেক সময় রক্তে মাত্রা ২৫০ বা ৩০০ মিগ্রা হলেও প্রস্রাবে আসে না। তখন বরং প্রস্রাবে বেশি করে প্রোটিন বার হতে থাকে—যা মধুমেহ-র একটি বিপজ্জনক চিহ্ন।

এছাড়াও ডায়াবেটিস রোগীদের প্রতি তিনমাস অন্তর HbA_1C পরীক্ষা করাতে পারলে ভালো। তবে পরীক্ষাটি করতে ৫০০-৬০০ টাকা লাগে। এছাড়াও বছরে অন্তত একবার লিপিড প্রোফাইল (কোলেস্টেরল, ট্রাইগ্লিসেরাইড ইত্যাদি) এবং প্রতি ছয় মাসে একবার প্রস্রাবে 'মাইক্রোঅ্যালবুমিন' (Microalbumin) করাতে পারলে ভালো। তবে দুটি পরীক্ষা নিয়ে মূল্য হাজার টাকারও বেশি পড়ে যাবে।

আর দু-তিনটি কথা বলব। প্রথমত, বাড়িতে 'গ্লুকোমিটার' যন্ত্রে অনেকেই নিজেদের রক্ত পরীক্ষা (self monitoring) করেন এবং বুদ্ধিমান রোগীরা চিকিৎসকের নির্দেশমতো ঔষধের মাত্রা কিছুটা ইতরবিশেষ করতে পারেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে গ্লুকোমিটারে যেহেতু শিরার বদলে কৈশিক ঝিল্লির (capillary) রক্ত ব্যবহৃত হচ্ছে, সেজন্য গ্লুকোজের পরিমাণ ১০-১৫ % বেশি হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, যেসব রোগীরা ঔষধ খাচ্ছেন বা ইনসুলিন নিচ্ছেন তাঁরা তা চালু রেখেই রক্ত পরীক্ষা করাবেন। ওষুধ বন্ধ করে নয়। এবং তাঁরা আর ৭৫ গ্রাম গ্লুকোজ খাবেন না। মধ্যাহ্নভোজে যে খাবারটা তাঁরা সচরাচর খান (ভাত বা রুটি) তাই খেয়েই দু ঘন্টা পরে রক্ত দেবেন।

তৃতীয়ত, মধ্যাহ্নভোজ খাবার ক্ষেত্রে ঠিক দু ঘন্টা কখন থেকে ধরা হবে? খাওয়া আরম্ভ করার সময় না শেষ করার সময়? এ বিষয়ে কোনো নির্দেশিকা নেই। আমার মতে মাঝামাঝি সময়টা ধরা যেতে পারে। এতে বিরাট তফাৎ হবার কথা নয়।

চতুর্থত, জ্বর অথবা অন্য কোনো সংক্রমণ থাকলে রক্ত পরীক্ষা করাবেন না। তাতে গ্লুকোজ বেশি আসতে পারে stress-এর জন্য।

চিকিৎসা

চিকিৎসা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় এই প্রবন্ধে আমরা যাবো না। কেননা রোগীরা তো নিজেদের চিকিৎসা নিজেরা করবেন না। আমরা আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব জীবনশৈলীর পরিবর্তন বা Life Style Modification-এর উপর।

দু-চার কথায় বলি, চিকিৎসায় যেসব ঔষধ ব্যবহার করা হয় তা মূলত দু প্রকার।

১। মুখে খাবার বড়ি— বহু ধরনের বড়ি আছে, নানা গোষ্ঠিতে বিভক্ত। সালফোনিলইউরিয়া, বাইগুয়ানাইড, পায়োগ্লিটাজোন, অ্যাকারবোজ প্রভৃতি। এদের কাজের ধরন বিভিন্ন। কারো কাজ শরীরে যে ইনসুলিন রয়েছে তার কর্মক্ষমতা বাড়ানো, কারো কাজ অন্ত্র থেকে গ্লুকোজের শোষণ কমানো। কোন ওষুধ কীভাবে ব্যবহৃত হয়— সে বিস্তৃত আলোচনায় গিয়ে পাঠকদের তথ্য ভারাক্রান্ত করে লাভ নেই।

ইনসুলিন— ১৯২৩ সালে ফ্রেডরিক গ্রান্ট ব্যান্টিং ইনসুলিন আবিষ্কার এবং মানবদেহে ডায়াবেটিসের নিরাময়ে তার প্রয়োগ করে নোবেল পুরষ্কার পান। এই ইনসুলিন বিশ্বের কোটি কোটি মধুমেহ আক্রান্ত মানুষকে নতুন জীবন দিয়েছে। প্রথমে গরু বা শুয়োরের অগ্ন্যাশয় থেকে ইনসুলিন নিষ্কাশিত হত। আজ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সফল প্রয়োগে 'হিউম্যান ইনসুলিন'-এর দাম নেমে এসেছে সাধ্যের মধ্যে। ইনসুলিনেরও বহু প্রকারভেদ। কতক্ষণ ধরে কর্মক্ষম থাকবে, কোন পদার্থের সঙ্গে মিশ্রণ করা হচ্ছে সেই সব -এর উপর ভিত্তি করে। রেগুলার, পি জেড আই, লেন্টি, মিক্সটার্ড প্রভৃতি। ইনসুলিন প্রোটিন বলে তা মুখে খাওয়া যায় না— কারণ তাহলে পাকস্থলি ও অন্ত্রে ভেঙ্গে যাবে। চামড়ার তলায় ইঞ্জেকশন দিতে হয়। বিদেশে Continuous Infusion Pump ও পাওয়া যায়। বর্তমানে চেষ্টা চলছে নাকে স্প্রে হিসাবে ইনসুলিন দেবার। তাতে বারবার এবং প্রতিদিন ইঞ্জেকশন নেবার ঝক্কি কমে যাবে।

জীবনশৈলীর পরিবর্তন

আপনি মধুমেহ নিয়ে কিভাবে দীর্ঘদিন স্বাভাবিক জীবনযাত্রাসহ বাঁচবেন তা নির্ভর করছে আপনারই উপর। যত দিন যাচ্ছে তত অল্প বয়সিরা আক্রান্ত হচ্ছেন এই রোগে—জাতি, ধর্ম, বর্ণ এমন কি আর্থিক অবস্থা নির্বিশেষে। ডায়াবেটিস নিয়েও দীর্ঘদিন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকলতা এড়িয়ে বাঁচা যায়—যদি আপনি নিজের জীবনযাত্রার গতিপ্রকৃতি পরিবর্তিত করেন। মনে রাখতে হবে ডায়াবেটিস এক দীর্ঘকালীন, অ-নিরাময়যোগ্য রোগ। কিন্তু একে অবশ্যই নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। সম্ভব ডায়াবেটিস নিয়েও সুস্থ ভাবে বাঁচা।

প্রাচীন মিশরীয় পুঁথিতে খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ বছর আগেও ডায়াবেটিসের উল্লেখ আছে 'প্রচুর প্রস্রাব

হয়' এমন অসুখ বলে। মধুমেহ নামের অর্থ 'সুমিষ্ট প্রস্রাব'। প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসকরা দেখেছিলেন এই ধরনের রোগীর প্রস্রাবে পিঁপড়ে ধরে যায়। গ্রিক ভিষগ অ্যাপোলোনিয়াস প্রথম 'ডায়াবেটিস' শব্দটি ব্যবহার করেন। রোমান ভিষগ গ্যালেনের বইতেও এর উল্লেখ আছে। ভারতবর্ষে চরক এবং সুশ্রুত সংহিতায় (৪৪-৫০০ খৃষ্টাব্দ) পরিষ্কার উল্লেখ আছে যে আজকের 'টাইপ-১' ও 'টাইপ-২' ডায়াবেটিস দুই ধরনের দুটি রোগ। একটি অল্প বয়সিদের হয়, অন্যটি স্থূলকায় পরিণত বয়সিদের।

অতএব মধুমেহের ইতিহাসও যেমন বহু প্রাচীন, তেমনই তার বিরুদ্ধে সংগ্রামও। এই সংগ্রামে আপনার হাতিয়ার হল—

১। খাদ্যাভ্যাস— শর্করা জাতীয় খাদ্য যথাসম্ভব বর্জন। বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল আপনার বয়স, দৈহিক পরিশ্রম, দেহের ওজন ও উচ্চতা অনুসারে দৈনিক ক্যালরি দরকার (১৮০০ থেকে ২০০০-এর মধ্যে) তার পরিমাপ করা বিজ্ঞানসম্মতভাবে এবং তা কঠোরভাবে মেনে চলা। মনে রাখতে হবে যেকোনো ক্যালরিযুক্ত খাবারই অতিরিক্ত পরিমাণে খেলে তা শরীরের মধ্যে গ্লুকোজে পরিণত হবে। তাই দু-এক চামচ চিনি বা একটা সন্দেশ খাওয়া চলতেই পারে। কিন্তু মোট ক্যালরির পরিমাণ কখনই বাড়ানো চলবে না। এর সঙ্গে বাদ দিতে হবে তেল, ঘি, ভাজাভুজি, জাঙ্ক ফুড, উচ্চকোটি সমাজের পিজা-পাসতা, বেকন, হ্যাম, সসেজ প্রভৃতিও। বাদ দিতে হবে তেল চুপচুপে বাঙালি খানা বা মোগলাই খানা।

২। কায়িক পরিশ্রম ও ব্যায়াম— অতিরিক্ত ক্যালরিকে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। রক্তে গ্লুকোজ কমাবার এক ভালো উপায় হচ্ছে দিনে অন্তত দু থেকে চার কিলোমিটার জোরে জোরে হাঁটা (brisk walking), খালি হাতে ব্যায়াম করা, সাঁতার কাটা, জগিং করা, দৌড়ানো। 'ওয়াকার' জাতীয় যন্ত্রও ব্যবহার করা যেতে পারে। যাদের কাজকর্ম মূলত বসে বসে (Sedentary Work) তাদের অবশ্যই ব্যায়াম করতে হবে। সারাদিন গাড়িতে না চড়া, লিফটের বদলে সিঁড়ি ব্যবহার করা—এইসবও গুরুত্বপূর্ণ।

৩। ধূমপান ও মদ্যপান বর্জন করা।

৪। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা। অন্য ক্রনিক অসুখ থাকলে তার চিকিৎসা করা।

৫। মানসিক চাপ (stress) কমানো— মানসিক চাপ বাড়লে মধুমেহ রোগীদের রক্তে যে শর্করার পরিমাণ বাড়ে তা পরীক্ষিত সত্য। অতএব মানসিক চাপ কমাতেই হবে। বই পড়ে, গান শুনে, ধ্যান করে, যোগ অভ্যাস করে— যে যেভাবে মানসিক প্রশান্তি পান, তাই নিয়মিত ভাবে চর্চা করতে পারেন।

সংক্ষেপে এই হল মধুমেহতার হালহকিকৎ। একটা সাধারণ ধারণা দেবার চেষ্টা করলাম মাত্র। বহু প্রশ্ন এর পরেও রয়ে গেল। ভবিষ্যতের কোনো প্রবন্ধে তার উত্তর দেবার চেষ্টা করা যাবে।

লেখক পরিচিতিঃ ডা. সিদ্ধার্থ গুপ্ত এম বি বি এস, ডি সি পি, এম ডি, প্যাথোলজি ও বায়োকেমিস্ট্রি বিশেষজ্ঞ, প্রাবন্ধিক ও সাহিত্যিক।

কুইজ

এবারের কুইজটি তৈরি করেছেন **অভিষেক দাস**। বর্তমানে পুনেতে এম বি বি এস পাঠরত।

১. ভারতীয় দন্ডবিধির ৩২০ ধারা কোন অপরাধের জন্য প্রযোজ্য?

২. খুব স্বল্পমেয়াদী বেদনাদায়ক শল্যচিকিৎসা প্রক্রিয়ার জন্য রোগীকে অজ্ঞান করতে কোন ইঞ্জেকশন ব্যবহার করা হয়?

৩. মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন যাকে চলতি কথায় হার্ট অ্যাটাক বলে—এর চিকিৎসা কতক্ষণ সময়ের মধ্যে শুরু করলে রোগীর প্রাণহানির আশঙ্কা সবচেয়ে কম থাকে?

৪. 'হেলা (HeLa)' নামক অমর কোষ চিকিৎসাশাস্ত্রে গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হয়—এই কোষের নাম কার নাম অনুসারে?

৫. কলেরা রোগের নাম সবার জানা। এই রোগের জীবাণুর নাম কি? এই জীবাণু কেমন আকৃতির? পৃথিবীতে এর প্রাদুর্ভাব কমে যাওয়ার পরেও ১৯৯২ সালে বাংলাদেশে এক নতুন ধরনের কলেরার জীবাণু দ্বারা মহামারী হয়েছিল—তার নাম কি?

৬. গরমে 'সানস্ট্রোক' হলে শতকরা মৃত্যুহার ৪০ ভাগেরও বেশি। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই প্রাথমিক চিকিৎসা কি করা উচিৎ?

৭. ম্যালেরিয়ার পরজীবি প্রধানত মানবশরীরের কোন কোষকে আক্রমণ করে? কোন ধরনের ম্যালেরিয়ার জীবাণু দীর্ঘদিন যকৃত বা লিভারে বাসা বেঁধে থাকে?

৮. কোন বিশেষ ধরনের রক্তাল্পতায় আক্রান্ত রোগীদের (বিশেষ করে শৈশবে) ফ্যালসিফেরাম ম্যালেরিয়া হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে?

৯. যক্ষ্মারোগের জীবাণুর কোষে কোন কোন ওষুধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে উঠলে সেই জীবাণুকে একাধিক ওষুধ প্রতিরোধী বা মাল্টিড্রাগ রেসিস্ট্যান্ট যক্ষ্মা বলা হয়?

১০. ১৪ নভেম্বর সারা বিশ্বে শিশুদিবস হিসাবে পালিত হয়। কোন সালে কোন সংস্থা প্রথম শিশুদিবস পালন করে?

উত্তর ২৯ পাতায়

স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার স্বাস্থ্যোদ্ধার হবে কি আমিরের পথে?

২৭ শে মে অনেকগুলি টিভি চ্যানেলে একসঙ্গে আমির খানের অনুষ্ঠান 'সত্যমেব জয়তে' প্রচারিত হওয়ার পর চিকিৎসকদের একাংশ আমিরের উপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছেন। স্ত্রী-ভ্রূণ হত্যা, পণপ্রথা বা শিশুদের যৌন শোষণের বিরোধিতার পর— আমির খান এবার প্রশ্ন তুলেছেন— 'Does Healthcare Need Healing?'— চিকিৎসা ব্যবস্থারই কি চিকিৎসা দরকার? আক্রমণের বর্শামুখ এবার চিকিৎসকদের দিকে— লিখছেন **ডা. পুণ্যব্রত গুণ**।

অনেকে বলছেন আমির কেবল দুর্নীতিগ্রস্ত ডাক্তারদের আক্রমণ করেছেন এমন নয়, সত্যমেব জয়তে সামগ্রিক ভাবে চিকিৎসককুলকেই অপমান করেছে। ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন দাবি করেছে— চিকিৎসকদের দুর্নাম রটানোর জন্য আমির খানকে ক্ষমা চাইতে হবে, না হলে আইনের আশ্রয় নেবে তারা। আবার অনেকের বক্তব্য— আই এম এ কি বলল তাতে কিছু এসে যায় না, আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার ডাক্তারদের এক-তৃতীয়াংশেরও কম সংখ্যক ভারতীয় ডাক্তার আই এম এ-র সদস্য, আই এম এ সব ডাক্তারদের প্রতিনিধিত্ব করে না। সাধারণ মানুষ কিন্তু এই অনুষ্ঠানকে একই চোখে দেখেন নি, তারা বরং অনুষ্ঠানে বর্ণিত ঘটনাগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চেয়েছেন নিজেদের জীবনের চিকিৎসা সংক্রান্ত অভিজ্ঞতাগুলোকে। অনেক ক্ষেত্রেই অভিজ্ঞতা মিলে গেছে।

আসলে চিকিৎসকের পেশাটা অন্যরকম। এখানে মানুষের জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে প্রাচীর হয়ে দাঁড়াতে পারেন একজন পেশাদার। রোগীর রোগ নির্ণয় করতে পারেন, অনেক ক্ষেত্রে রোগ সারাতে পারেন, না পারলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রোগীর কষ্ট কমাতে পারেন। ডাক্তারদের সাধারণ মানুষ ভগবানের আসনে বসান তাই যুগ-যুগান্ত ধরে। (যদিও ভগবান আছেন কিনা, বা থাকলেও তিনি মানুষের ভালো করেন কিনা, সে প্রশ্ন একেবারে স্বতন্ত্র)। ভগবানের পদস্খলন কি মেনে নেওয়া যায়!

চিকিৎসাকে যদি পণ্য হিসেবে দেখেন তাহলে অন্যান্য পণ্যের সঙ্গে এ পণ্যের ফারাক আছে। দোকানে গিয়ে কোন ব্র্যান্ডের সাবান বা টুথপেস্ট কিনবেন তা আপনি নিজে ঠিক করেন, কিন্তু চিকিৎসা করাতে গিয়ে আপনি কোন কোন পরীক্ষা করাবেন বা কোন কোন ওষুধ খাবেন তা আপনার হয়ে ঠিক করে দেন অন্য কেউ— আপনার চিকিৎসক। তিনি দুর্নীতিগ্রস্ত হলে তাই মুশকিল।

একজন চিকিৎসক হিসেবে আমি জোরের সঙ্গেই বলব— সত্যমেব জয়তে-তে যেসব দুর্নীতির কথা বলা হয়েছে, সেরকম হয়। যে সমাজব্যবস্থায় সাংসদ বা বিধায়ক হওয়ার পর অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতা কোটিপতি হয়ে যান, সেখানে উৎকোচ দিয়ে বিচারের রায়কে প্রভাবিত করা যায়, পুলিশ যেখানে পয়সার বশ, যেখানে ঘুষ না দিলে সরকারি দপ্তরের ফাইল নড়ে না, সেখানে ডাক্তাররাই কেবল দুর্নীতির ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলবেন— এমনটা ভাবা অযৌক্তিক। ডাক্তারি পড়তে যাঁরা ভর্তি হন, মেধা-তালিকায় তাঁরা থাকেন প্রথম দিকে (অবশ্য ক্যাপটিশেন ফি দিয়ে বেসরকারি মেডিকেল কলেজে যাঁরা ভর্তি হন, তাঁদের কথা বলছি না), তাছাড়া তাঁরা তো এই সমাজেই উদ্ভূত, সমাজের অন্য পেশার মানুষদের মতোই দোষ-গুণে ভরা মানুষ তাঁরা।

যে সমাজব্যবস্থায় সাংসদ বা বিধায়ক হওয়ার পর অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতা কোটিপতি হয়ে যান, সেখানে উৎকোচ দিয়ে বিচারের রায়কে প্রভাবিত করা যায়, পুলিশ যেখানে পয়সার বশ, যেখানে ঘুষ না দিলে সরকারি দপ্তরের ফাইল নড়ে না, সেখানে ডাক্তাররাই কেবল দুর্নীতির ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলবেন— এমনটা ভাবা অযৌক্তিক।

ব্যক্তিগত ভাবে আমার মনে হয় চিকিৎসা পেশার বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্যের জন্য এই পেশার মানুষদের অন্যরকম হওয়া উচিত। মহান শল্যচিকিৎসক ডা. নর্মান বেথুন যেমন বলেছিলেন তেমন হওয়া উচিত তাঁদের পেশার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি— " The function of medicine is greater than the maintenance of the doctor's position; the security of the people's health is our primary duty; we are the servants not the masters of the people, human rights are above professional privileges." কিন্তু বাস্তবে এ দৃষ্টিভঙ্গি কজনের দেখা যায়?

ডাক্তারি পাস করার পর মেডিকেল কাউন্সিলে নথিভুক্ত হওয়ার সময় ডাক্তারদের নীতি-নৈতিকতার শপথ নিতে হয়, সে শপথ আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার জনক হিপোক্রেটিসের নামে নামাঙ্কিত। ডাক্তাররা যদি অন্তত সে শপথ মেনে চলতেন বা চলতে পারতেন তাহলেও সমস্যা হত না।

সত্যমেব জয়তে-তে আমির খান যে ঘটনাগুলো দেখিয়েছেন সেগুলোর দিকে নজর ফেরানো যাক।

- একজন ডায়াবেটিস রোগীকে দেখানো হয়েছে, যাঁর পায়ের এক ঘায়ের জন্য একজন ডাক্তার তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করেন, পায়ের একটা আঙুল কেটে বাদ দেওয়া হয়। পরে আর একজন ডাক্তার তাঁকে বলেন অ্যান্টিবায়োটিক দিলেই হত, আঙুল কাটার দরকার ছিল না। চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্পর্কে যাঁদের ন্যূনতম ধারণা আছে তাঁরা ভালো করেই জানেন যে হাতের আঙুল-পায়ের আঙুল এমনকি হাত পা কেটে বাদ দিতে হতে পারে অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিসে জীবাণু সংক্রমণ প্রতিহত করার জন্যই।
- মেজর পঙ্কজ রাই ও তাঁর মেয়ের সাক্ষাৎকার দেখানো হয়েছে। মেজর রাই-এর স্ত্রী কিডনি ও অগ্ন্যাশয় প্রতিস্থাপন করতে গিয়ে মারা যান। আমির খানের এই অনুষ্ঠানের বিরোধীরা ব্যঙ্গ করছেন যে টিভির পর্দায় মেজর রাই

নাটক করেছেন। আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই। কিন্তু তাঁর সাক্ষাৎকারে কিছু প্রশ্ন থেকেই যায়— মৃতদেহ থেকে কিডনি ও অগ্ন্যাশয় নিয়ে শ্রীমতি রাই-এর শরীরে প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল, এসব ক্ষেত্রে সবসময়ই অনুমতি নিয়ে রাখা হয় অনেক আগে থেকে, সুতরাং অনুমতি না নিয়ে শ্রীমতি রাই-এর অপারেশন করা হয়েছিল এমনটা হতে পারে না। শ্রীমতি রাইকে যত বোতল রক্ত দেওয়া হয়েছিল বলা হয়েছে সে হিসেব মিলছে না চিকিৎসক দলের নেফ্রলজিস্টের হিসেবের সঙ্গে। নেফ্রলজিস্টের কথা অনুযায়ী শ্রীমতি রাই-এর DIC (disseminated intravascular coagulation) হয়েছিল। কার এই সমস্যা হবে তা আগে থেকে বোঝা বা বলা যায় না আর এমনটা হলে রক্ত-সঞ্চালন ছাড়া চিকিৎসা নেই তেমন কিছু।

- অন্ধ্রপ্রদেশের এক গ্রামাঞ্চলের কাহিনী দেখানো হয়েছে, যেখানকার অধিকাংশ মহিলাকে নাকি অপ্রয়োজনে জরায়ুকর্তন করা হয়েছে। সমস্ত জরায়ুকর্তন (hysterectomy)-ই প্রয়োজনীয় এমনটা বলা যায় না, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে জরায়ুকর্তন প্রথম পছন্দের চিকিৎসা না হলেও তা করতে হয় উন্নততর চিকিৎসা পদ্ধতির সুযোগ বা ব্যবস্থা না থাকায়। রোগী নিশ্চয়ই কোনো সমস্যা নিয়ে স্ত্রী-রোগ বিশেষজ্ঞের কাছে গেছেন, না হলে ডাক্তার অপারেশনের সুযোগ পাবেন কেমন করে? আমির যে মহিলাদের দেখিয়েছেন, তাঁরা ডাক্তারের কাছে কোন সমস্যা নিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁদের রের্কডে কোন রোগের জন্য অপারেশন করার কথা বলা আছে সেসব পরিষ্কার হয়নি আমিরের অনুষ্ঠানে।
- একজন প্যাথোলজিস্ট কমিশন প্রথা নিয়ে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। কেবল প্যাথোলজি পরীক্ষাতেই নয়, সমস্ত ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষাতেই ব্যাপক ভাবে কমিশন চলে। প্যাথোলজিতে ৫০% অবধি, আল্ট্রাসোনোগ্রাফিতে ২৫ %, সিটি স্ক্যানে ৩৩%, এক্স রে তে প্লেট পিছু ২০-২৫ টাকা পাওয়া যেতে পারে কমিশন হিসেবে। অনেক ডাক্তার কমিশন নেন এটা যেমন সত্যি, তেমনই অনেকে কমিশন নেন না, ল্যাবরেটরিকে বাধ্য করেন রোগীর খরচ থেকে কমিশনের অংশটা বাদ দিতে— সেকথাটাও সত্যি, সেকথা বলা হয়নি আমির খানের অনুষ্ঠানে।
- একজন অতিবিশেষজ্ঞ শল্যচিকিৎসককে দেখানো হয়, যিনি রেফারিং ডাক্তারদের কমিশন দিতে নারাজ হয়ে বিদেশে ফিরে যান। রেফারিং ডাক্তাররা কেউ কেউ কমিশন চান এমনটা ঘটনা, কিন্তু এটাও ঘটনা যে বিশাল সংখ্যক ডাক্তার কিন্তু পরস্পরের কাছ থেকে কমিশন না নিয়ে-না দিয়ে এদেশেই ডাক্তারি করে চলেছেন।
- আমির খানের টক শো-তে এক অবসরপ্রাপ্ত সেনা-চিকিৎসক যিনি মেডিকেল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ছিলেন, মেডিকেল কাউন্সিলের নানা দুর্নীতি নিয়ে, বিশেষত, প্রাইভেট মেডিকেল কলেজগুলোকে অনুমোদন-সংক্রান্ত দুর্নীতি নিয়ে বলেছেন। খবরের কাগজ পড়ে আমরা আগে থেকেই জানি যে এমন দুর্নীতি করতে গিয়ে এম সি আই-এর পূর্বতন প্রধান দন্ডিত।
- এম সি আই-এর স্থান নেওয়া বর্তমান কমিটির প্রধানও আমিরের প্রশ্নের উত্তরে চিকিৎসকদের দুর্নীতি ও দুর্নীতি-দমনে এম সি আই-এর নিষ্ক্রিয়তার কথা স্বীকার করেছেন।
- MIMS (মান্থলি ইনডেক্স অফ মেডিকেল স্পেশালিটি)-র সম্পাদক ডা. চন্দ্র মোহন গুলাটি ভারতের ওষুধ-কোম্পানিগুলোর দুর্নীতি, নিজ কোম্পানির ওষুধ লেখাতে ডাক্তারদের ঘুষ দেওয়া— সেসবের কথা বলেছেন। ভারতে ওষুধের যুক্তিসঙ্গত ব্যবহারের আন্দোলনে এক পুরোধা পুরুষ ডা. গুলাটি। তাঁর বক্তব্যে কিন্তু এ বিষয়ে সরকারি নিষ্ক্রিয়তার ব্যাপারে আরও সরব হওয়া উচিত ছিল।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে আমির খান সমস্যার সমাধান হিসেবে কিছু উদাহরণ তুলে ধরেছেন—

- রাজস্থানের এক চিকিৎসক আই এ এস-এর কথা আমরা আগেই জানতাম। তিনি এক জেলার জেলাশাসক থাকার সময় সরকারি উদ্যোগে জেনেরিক নামের ওষুধের দোকান খুলেছিলেন। তামিলনাড়ুতেও এধরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ১৯ শে জুন এক সংসদীয় কমিটির আহ্বানে গিয়ে আমির খান সারা দেশে জেনেরিক নামের ওষুধের দোকান খোলার প্রস্তাব দিয়েছেন।
- আমির খানের আর এক সমাধান চিকিৎসা-বিমা। নারায়ণ হৃদয়ালয় ও সরকারের যৌথ উদ্যোগে দক্ষিণের কোনো কোনো রাজ্যে চিকিৎসা বিমা চালু করা হয়েছে। এক শিশু হৃদরোগী কন্যার কাহিনী শুনিয়ে আমির সেই চিকিৎসা-বিমা ব্যবস্থার গুণগান গেয়েছেন। তার চিকিৎসায় উদ্যোগী হয়েছেন ডা. দেবী শেঠি। ডা. শেঠি নিঃসন্দেহে এক দক্ষ-উদ্যমী হৃৎ-শল্য-চিকিৎসক। এম সি আই-এর স্থান নিয়েছে যে কমিটি সেই কমিটির অন্যতম সদস্যও তিনি। একই সাথে তিনি এক সফল চিকিৎসা ব্যবসায়ী, প্যারামেডিক্যাল শিক্ষা (ভবিষ্যতে হয়তো মেডিক্যাল শিক্ষা)-ব্যবসায়ী। তাঁর

রাজস্থানের এক চিকিৎসক আই এ এস-এর কথা আমরা আগেই জানতাম। তিনি এক জেলার জেলাশাসক থাকার সময় সরকারি উদ্যোগে জেনেরিক নামের ওষুধের দোকান খুলেছিলেন। তামিলনাড়ুতেও এধরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ১৯ শে জুন এক সংসদীয় কমিটির আহ্বানে গিয়ে আমির খান সারা দেশে জেনেরিক নামের ওষুধের দোকান খোলার প্রস্তাব দিয়েছেন।

হাসপাতালে চিকিৎসার মান বেশ ভালো, চিকিৎসার খরচ কম কিছু নয়, অনেক রোগীর কাছ থেকে মুনাফা করার পর মাঝে-সাঝে একটা-দুটো অপারেশন তাঁরা কম খরচে বা বিনা খরচে করেন। তবে ডা. শেঠির নাম-মাহাত্ম্য এমনই যে সেই একটা-দুটোই সংবাদমাধ্যমে প্রচার পায়। পশ্চিমবঙ্গের পরিবর্তনের সরকারের সাথে প্রাইভেট পাবলিক পার্টনারশিপে শীঘ্রই আমরা তাঁকে নতুন ভূমিকায় দেখব, যেখানে সরকারি জমিতে, সরকারি পরিকাঠামোয় হাসপাতাল বানিয়ে পরিষেবা দেবে, অবশ্যই মুনাফা করবে তাঁর সংস্থা।

আমিরের সমাধান সমাধান নয়

সরকার ওষুধ-কোম্পানিগুলোকে অপ্রয়োজনীয়, ক্ষতিকর, বিদেশে নিষিদ্ধ, নিষিদ্ধ হওয়ার উপযুক্ত ওষুধ উৎপাদনে বাধা দেবে না, জেনেরিক নামের ওষুধ উৎপাদনে বাধ্য করবে না, অত্যাবশ্যক ওষুধ উৎপাদনে বাধ্য করবে না— অথচ আশা করা হবে চিকিৎসক জেনেরিক নাম (সঠিক শব্দটা হল আন্তর্জাতিক অব্যবসায়িক নাম বা INN— International Non-proprietary Name)-এ ওষুধ লিখবেন?!

সমাধানের রাস্তা দেখানো হয়েছিল কিন্তু আজ থেকে ৩৭ বছর আগে, যখন জয় শুকলাল হাথীর নেতৃত্বাধীন সংসদীয় কমিটি ১৯৭৫-এ বাজারের প্রায় ৬০ হাজার ফরমুলেশনের বদলে ১১৭টা ওষুধকে দেশের জন্য অত্যাবশ্যক হিসেবে চিহ্নিত করেছিল, ওষুধ-কোম্পানিগুলোতে বিদেশি বিনিয়োগের মাত্রা কমিয়ে এনে পরে কোম্পানিগুলোকে জাতীয়করণের সুপারিশ করেছিল। আজ যদি ডাক্তার কেবল প্রয়োজনীয় ওষুধই লেখেন জেনেরিক নামে, তার অধিকাংশই দোকানে পাওয়া যাবে না। বেশির ভাগ ওষুধ কোম্পানির জেনেরিক ডিভিশন আজ যেসব ওষুধ তৈরি করে তাদেরও ব্র্যান্ড নাম আছে, এদের পোশাকি নাম ব্র্যান্ডেড জেনেরিক্স। জেনেরিক নামের ওষুধ লিখলে কোন ব্র্যান্ডের ওষুধ রোগী পাবেন তা নির্ভর করবে ওষুধের দোকানির ওপর। যে ব্র্যান্ডে দোকানির লাভ বেশি সেই ব্র্যান্ডই পাবেন রোগী। এর চেয়ে বরং ডাক্তার কমদামি ব্র্যান্ড লিখলে রোগীর খরচ কমবে।

আমির খানের বিরোধিতা করতে গিয়ে অনেক চিকিৎসক জেনেরিক নামের ওষুধের বিরোধিতা করছেন। বর্তমান লেখকের প্রায় তিন দশকের চিকিৎসক জীবনের অভিজ্ঞতা কিন্তু অন্য। গুণবত্তায় ও কার্যকারিতায় জেনেরিক নামের বা কমদামি ব্র্যান্ডের সঙ্গে দামি ব্র্যান্ডের কোনো ফারাক নেই। দামি কোম্পানির দামি ওষুধের মোড়কে ছোট অক্ষরে লেখা (fine prints) দেখুন। দেখবেন সে ওষুধ অধিকাংশ ক্ষেত্রে তৈরি হয়েছে (manufactured at) ছোট কোনো কোম্পানিতে, বাজারজাত করছে (marketed by) নামি-দামি কোম্পানি।

চিকিৎসা বিমা সমাধান নয়, চিকিৎসা বিমার আঁতুড় ঘর আমেরিকায় কিন্তু সব নাগরিকের চিকিৎসার সুযোগ নেই।

আসল সমাধান অন্য পথে। যে দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার ধাঁচে আমাদের দেশের আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার শুরু— সে দেশ গ্রেট ব্রিটেন সমাজতান্ত্রিক দেশ নয়, অথচ সে দেশে ৪০-এর দশকের শেষ থেকে নাগরিকদের চিকিৎসা পরিষেবা দিত জাতীয় স্বাস্থ্য প্রকল্প (National Health Scheme)। ডাক্তাররা সেখানে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতেন না, তাঁরা ছিলেন রাষ্ট্রের কর্মচারি। রোগী কোন প্রাথমিক চিকিৎসককে দেখাবে তা নির্ভর করত কোন অঞ্চলে তিনি থাকেন তার ওপর, প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য নির্দিষ্ট প্রাথমিক চিকিৎসক থাকতেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষা কিছু করাতে হলে চিকিৎসক পাঠাতেন NHS-র নির্দিষ্ট সংস্থায়, কোন এলাকার প্রাথমিক চিকিৎসক কোন বিশেষজ্ঞ বা অতি বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠাবেন তাও NHS নির্দিষ্ট করা থাকত। ডাক্তাররা কেবল ওষুধ লিখতে পারতেন একটি নির্দিষ্ট তালিকা থেকে, যার নাম BNF (British National Formulary), বছরে তার চারটে সংস্করণ বেরোয়, তার অনলাইন সংস্করণ আছে, ছাপা বই তিন মাস ছাড়া ডাক্তারের কাছে পৌঁছে যায়। মার্গারেট থ্যাচারের সময় থেকে NHS-কে জলাঞ্জলি দেওয়ার প্রয়াস চলতে থাকলেও এখনো তা পুরোপুরি ভেঙে পড়ে নি।

এমন এক ব্যবস্থাই আসলে সমাধান। যেখানে ডাক্তার-রোগীর মাঝে লেনদেনের সম্পর্ক থাকবে না, যেখানে রাষ্ট্র নাগরিকের স্বাস্থ্যরক্ষার দায়িত্ব নেবে, এমন এক ব্যবস্থাই আসলে দুর্নীতি-মুক্ত হতে পারে।

রাষ্ট্র চিকিৎসা-পরিষেবা থেকে হাত গুটিয়ে নিচ্ছে, দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত হচ্ছে চিকিৎসা পরিষেবা— সে বিষয়ে নীরব থেকে কেবল চিকিৎসকদের ঘাড়ে সব দোষ চাপানো সমীচীন নয়। তবু আমির খানকে ধন্যবাদ জানাবো এক জ্বলন্ত সমস্যার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করানোর জন্য, তা তিনি 'সত্যমেব জয়তে'-র এপিসোড পিছু যত কোটি টাকাই পেয়ে থাকুন না কেন।

লেখক পরিচিতি: ডা. পুণ্যব্রত গুণ, এম বি বি এস, জেনেরাল ফিজিশিয়ান, জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের এক কর্মি। বর্তমানে হাওড়ার উলুবেড়িয়া মহকুমায় শ্রমজীবী মানুষের জন্য পরিচালিত এক ক্লিনিকের দায়িত্বে আছেন।

একক মাত্রা advt.

গদ্য প্রবন্ধের এক আধুনিক ক্যানভাস
সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, মিডিয়া ও বিবিধ বিষয়ে এক অন্যতর গবেষণা ও আলোচনাপত্র
পাওয়া যাচ্ছে প্রায় সমস্ত স্টলে
গ্রাহক চাঁদা:১০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০০ টাকা (আজীবন)
আজীবন গ্রাহকেরা পুরনো সংখ্যার একটি সেট বিনামূল্যে পাবেন
যোগাযোগ : ১৫০, মুক্তারাম বাবু স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৭
দূরভাষ : ৯৮৩০২৩৬০৭৬ / ৯৮৩০৪৯৩২৩৯

ডাক্তারের ডেস্ক

প্রশ্নঃ কানের খোল কিভাবে পরিষ্কার করব এবং কতদিন পর পর করা উচিত? — মিলন সূত্রধর, যোগেশ পল্লি, বাঁকুড়া।

উত্তরঃ কানের খোল নিয়মিত পরিষ্কার করার প্রয়োজন অনেক সময়ই হয় না; কারণ, কানের খোল স্বাভাবিক নিয়মেই বেরিয়ে যায়। ১-২ সপ্তাহ পর পর কানের খোল পরিষ্কার করা যেতে পারে। সেটা করা উচিত কাঠির আগায় তুলো জড়িয়ে বা Ear bud দিয়ে অতি সাবধানে, খুব জোর না দিয়ে।

কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন আসে কানের খোল জিনিষটা আসলে কী? কানের খোল হল কানের নালীর সিবেসিয়াস গ্রন্থি, সেরুমিনাস গ্রন্থি নিঃসৃত পদার্থ, কানের ভিতরকার চুল, ধুলো-ময়লা ইত্যাদির মিশ্রিত রূপ।

কাদের ক্ষেত্রে কানের খোল সমস্যার সৃষ্টি করে? যাদের রাস্তা-ঘাটে ধুলো-ময়লার মধ্যে বেশিক্ষণ কাজ করতে হয়, কানের ভেতর চুলের পরিমাণ বেশি থাকে, উপরোক্ত গ্রন্থির ক্ষরণ বেশি হয়।

কানে খোল হলে তার উপসর্গ কী হয়? সাধারণ ভাবে কানের খোলের কারণে খুব বেশি উপসর্গ দেখা যায় না। শুধুমাত্র কানে একটু অস্বস্তি, সড়সড় করার অনুভূতি হতে পারে।

কিন্তু কানে খোল জমে শক্ত হয়ে গেলে উপসর্গ বেশি হয়। কান বন্ধ হয়ে গেছে বলে মনে হয়। কান ভারি লাগে, কম শুনতে পাওয়া যায়, কানে ব্যথা হতে পারে। বিশেষত, স্নানের পর উপসর্গগুলি বেশি হয়। বাইরের জিনিষ যেমন ছোটো পুঁতি জাতীয় কিছু ঢুকে গেছে, পরে তার চারপাশে কানের খোল জমে শক্ত খোলের আকার নিয়েছে এরকমও হতে পারে। এক্ষেত্রে বাচ্চাকে অবশ্যই চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত। বাচ্চাদের কানে খোল অহেতুক বাড়িতে খোঁচাখুঁচি না করাই ভালো।

—উত্তর দিয়েছেন ডা. অর্কজ্যোতি মুখার্জি ও ডা. সোনিয়া বেগম। ডা. অর্কজ্যোতি মুখার্জি কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করে স্নাতকোত্তর প্রশিক্ষণের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ডা. সোনিয়া বেগম এম বি বি এস, বর্তমানে স্নাতকোত্তর পাঠ নিচ্ছেন।

প্রশ্নঃ আমার ছেলের বয়স সাড়ে আট বছর। ক্লাস থ্রি-তে পড়ে। ভীষণ ছটফটে এবং পড়াশোনা ঠিক মত করে না। স্কুলেও অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে মারামারি করে। একটুতেই রেগে যায়। প্রায়ই স্কুল থেকে 'গার্জেন কল' করে। আমার বাচ্চাকে নিয়ে আমি খুবই চিন্তিত। এখন আমি কী করতে পারি? আমার বাচ্চাকে কি কোনো মানসিক ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত?

— শংকরী দে, সাঁইথিয়া, বীরভূম।

উত্তরঃ আপনি জানিয়েছেন আপনার ছেলে খুব ছটফটে এবং পড়াশুনা ঠিক মত করছে না। এছাড়া স্কুল থেকেও অভিযোগ আসছে, অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে নানা রকমের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ছে বলে।

আরো কিছু তথ্য থাকলে ভালো হত। যাই হোক আপনার চিঠি থেকে যা মনে হচ্ছে এটা বাচ্চাদের একটা বিশেষ রোগ— অ্যাটেনশন ডেফিসিট হাইপার-অ্যাক্টিভিটি ডিসঅর্ডার। এই ধরনের বাচ্চারা মনোযোগ দিয়ে প্রশ্ন শুনতে পারে না, যে জন্য বাড়ির কাজ (হোমওয়ার্ক) করতে অসুবিধা হয়, ভুলভ্রান্তি বেশি করে। ক্লাসে কোনো প্রশ্ন করলে পুরো শোনার আগেই উত্তর দিতে চায়, স্বাভাবিকভাবেই ভুল করে। এই ধরনের বাচ্চাদের শতকরা পঁচাত্তর ভাগের রাগ বেশি থাকে। তবে আপনার বাচ্চা বা অন্যান্য এই ধরনের বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আর একটি রোগ মাথায় রাখতে হয়, সেটা হচ্ছে শেখার অসুবিধা (Learning Disorder)— এই সমস্যার বাচ্চার 'অক্ষর' বা 'অঙ্ক'-র অনুভূতি অন্যরকম হয় বলে এদের পড়তে, লিখতে বা অঙ্ক করতে অসুবিধা হয়। এই পার্থক্য নির্ধারণ করতে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হয়।

দেখা গেছে শতকরা পঞ্চাশভাগ ক্ষেত্রে ১২ থেকে ২০ বছরের মধ্যে এই উপসর্গ চলে যায়। বাকি পঞ্চাশ ভাগের নানা ভাবে থেকে যায়। পররতীকালে কারো মধ্যে নেশাড়ু হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। কারো বা আচরণগত সমস্যা (Conduct Disorder)হতে পারে।

যেহেতু রোগটা একজন বাচ্চার শিক্ষার সময়ে দেখা যায় তাই সঠিক চিকিৎসার প্রয়োজন, তা না হলে ভবিষ্যৎ খারাপ হয়। রোগের চিকিৎসা ওষুধ ও সাইকোথেরাপি দিয়ে করা হয়। হতাশ হওয়ার কিছু নেই। আপনি নিকটবর্তি মনোবিদ বা মনোরোগ-বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। তিনি আপনাকে গাইড করবেন এবং জানাবেন আপনার বাচ্চার জন্য স্পেশাল এডুকেটর বা আর কোনো বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে কিনা।

— উত্তর দিয়েছেন ডা. সুমিত দাশ, এম বি বি এস, ডি পি এম, মনোরোগবিশেষজ্ঞ। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন। তা ছাড়াও যুক্ত আছেন শ্রমজীবি মানুষদের বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসার জন্য গড়ে ওঠা একটি ক্লিনিকের সাথে।

- স্বাস্থ্যের বৃত্তে: চিকিৎসার মানবিক মুখের সন্ধানে চেনা স্বপ্ন, অচেনা পথ
- বাণিজ্যিক নয়— মানবিক

হারপিস জোস্টার

চিকেন পক্স হলে আজকাল হাতে গোনা কিছু মানুষকেই পাওয়া যাবে যাঁরা মায়ের দয়া হয়েছে বলে মা শেতলার থানে গিয়ে ধর্না দেন—কারণ রোগটার গতিবিধি ও এটা একটা ভাইরাস ঘটিত রোগ এটা বেশির ভাগ মানুষই জেনে গেছেন। চিকেন পক্স রোগটা হয় ভ্যারিসেলা জোস্টার নামে একটা ভাইরাস দ্বারা। এই একই ভাইরাস যে আর একটা রোগের জন্য দায়ী সেটা সম্বন্ধে এখনো সবার সঠিক ধারণা নেই। রোগটির নাম 'হারপিস জোস্টার'— লিখছেন **ডা. শর্মিষ্ঠা দাস**।

কেন, কিভাবে হয়?

দেখা গেছে যে ৯৮% পূর্ণবয়স্ক মানুষের জীবনে কোনো এক সময়ে চিকেন পক্স বা জল বসন্ত হয়েছে। এই একবার চিকেন পক্স হল মানেই কিন্তু শরীরে হারপিস জোস্টারের বীজ বপন হয়ে গেল। চিকেন পক্সের সময়ে ভ্যারিসেলা জোস্টার ভাইরাস (সংক্ষেপে VZV) ত্বকের সংবেদী স্নায়ুবাহিত হয়ে সংবেদী স্নায়ু গ্রন্থিতে সারাজীবনের জন্য কিছুটা অকেজো ও ঘুমন্ত অবস্থায় বাসা বেঁধে থাকে। এরপর যেই কোনো কারণে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা একটু কমে যায়—ভাইরাসগুলো আবার পুনর্জীবিত এবং সক্রিয় হয়ে উঠে। তখন এই ভাইরাসের দল আবার সংবেদী স্নায়ুবাহিত হয়ে ত্বকের একটা বিশেষ অংশে হারপিস জোস্টারের ফোস্কা তৈরি করে। তাহলে এই রোগের প্রাথমিক শর্ত দুটো—পূর্বে কখনো চিকেন পক্স হওয়া আর সাধারণত রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া।

কি কি কারণে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কমে?

সুস্থ সাধারণ মানুষেরও বড় কোনো অসুখ, বেশি শারীরিক বা মানসিক ধকল, চরম আবহাওয়া—এইসব কারণে সাময়িক শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা যখন কিছুটা কমে তখন হারপিস জোস্টারের লক্ষণ দেখা দেয়। আবার সবসময়ে এরকম কোনও কারণ থাকে না— এমনিতে সুস্থ-সবল মানুষেরও হারপিস জোস্টার হতে পারে।

প্রতিরোধ ক্ষমতা বিশেষভাবে কমে— ১. এইচ আই ভি-এইডস রোগীর, ২. অঙ্গ প্রতিস্থাপন ও তার পরের চিকিৎসায়, ৩. ক্যানসার রোগ ও তার চিকিৎসায়, ৪. হজকিনস রোগ, ৫. অন্য কোনো রোগের চিকিৎসা যার জন্য দীর্ঘদিন স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ বা প্রতিরোধতন্ত্রকে প্রভাবিত করে এমন ওষুধ খেতে হয়, ৬. ডায়াবিটিস বা মধুমেহ রোগে।

উপসর্গ ও লক্ষণ

এক একটা সংবেদী স্নায়ু শরীরের এক একটা বিশেষ অঞ্চলের অনুভূতির বাহক। ভ্যারিসেলা জোস্টার ভাইরাস যে সংবেদী স্নায়ুকে আক্রমণ করে শুধু সেই অঞ্চলেই রোগটি প্রকাশ পায়। শরীরের দু-দিকে (ডান ও বাম) আলাদা আলাদা সংবেদী স্নায়ু থাকে বলে হারপিস জোস্টার শরীরের একদিকেই হয় (বিশেষ ব্যতিক্রম ছাড়া)। রোগের প্রকাশের ২-৩ সপ্তাহ আগে থেকে আক্রান্ত অঞ্চলে ব্যথা অনুভব হতে পারে। এরপর সেই জায়গায় ছোটো ছোটো জলভরা ফোস্কার মতো বেরোয়। ফোস্কাগুলো ২-৩ দিন ধরে ঝাঁকে ঝাঁকে বেরোয়। কখনো কখনো জলের সঙ্গে রক্তও থাকে। কিছুদিন পরে জলটা অনেক সময় পূঁজও হয়ে যায়। ফোস্কাগুলো ২-৩ সপ্তাহ থাকে। যেহেতু এই রোগে সংবেদী স্নায়ুর প্রদাহ হয় এবং সংবেদী স্নায়ু দিয়েই সবরকম ব্যথা বেদনার অনুভূতি বাহিত হয়—পুরো সময়টা আক্রান্ত অঞ্চলে অসহ্য ব্যথা হয়। পিন ফোটানোর মতো, জ্বলে-পুড়ে যাওয়ার মতো, ছুরি বেঁধার মতো, চিড়িক দিয়ে ওঠা, কেঁপে কেঁপে ওঠা, কনকনে, সামান্য ছোঁয়া লাগলেই প্রচন্ড ব্যথা—ইত্যাদি সব ধরনের ব্যথাই হয়।

আগেই বলা হয়েছে যে সাধারণত হারপিস জোস্টার শরীরের একদিকে হয়। একেবারে প্রতিরোধ ক্ষমতাহীন রোগীর দেহে এই রোগ একাধিক অংশে দেখা দিতে পারে এবং এর সঙ্গে শরীরের অন্যান্য জায়গায় চিকেন পক্সের মতো ফোস্কাও দেখা দেয়। ফোস্কার সঙ্গে হাল্কা জ্বর, গায়ে-হাতে-পায়ে ব্যথা, ম্যাজমেজে ভাব সবই হতে পারে।

হারপিস জোস্টার রোগীর থেকে ছোঁয়াচ লেগে অন্য লোকের হারপিস জোস্টার কখনো হয় না। ছোঁয়াচ লেগে চিকেন পক্স হতে পারে। তবে চিকেন পক্স রোগীর থেকে সংক্রমণ যে হারে ছড়ায় এখানে সেই হার অনেক কম। বাড়িতে কারো হারপিস জোস্টার হলে সেই বাড়িতে এমন কোনো শিশু যদি থাকে যার আগে চিকেন পক্স হয়নি তার চিকেন পক্স হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ভ্যারিসেলা জোস্টার ভাইরাসের প্রতিরোধী টিকা বেরোনোর পরে চিকেন পক্স এবং স্বভাবতই হারপিস জোস্টার-ও ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে।

হারপিস জোস্টার পরবর্তী স্নায়ুর বেদনা (Post herpitcic Neuralgia)

হারপিস জোস্টারের ফোস্কা তো ২-৩ সপ্তাহের মধ্যে শুকোলো। রোগী নিশ্চিন্ত হলেন। কিন্তু এরপর কিছুদিন পর থেকেই ওই অঞ্চলে শুরু হয় প্রচন্ড ব্যথা ও জ্বালার অনুভূতি। চামড়ার ফোস্কা শুকিয়ে গেলেও স্নায়ুর প্রদাহ কমতে অনেক বেশি সময় লাগে। এই কষ্ট অনেক সময় কয়েক মাস বা কয়েক বছরও স্থায়ী হয়। এতে ভয়ের কিছু নেই কিন্তু রোগীর কষ্ট কমানোরজ ন্যবি শেষকি ছু ওষুধ আছে।

অন্য কি কি রোগের লক্ষণ হারপিস জোস্টারের মতো হতে পারে ?

১. অনেক সময় গ্রীষ্ম বা বর্ষাকালে পোকার কামড়ে চামড়ায় যে ফোস্কা পড়ে তাকে অনেক সময় হারপিস জোস্টার বলে ভুল করা হয়। আবার উল্টোটাও দেখা যায়, যার ফলে হারপিস জোস্টার রোগী চার পাঁচ দিন পরে এসে বলেন, 'প্রথমে ভেবেছিলাম পোকা কামড়েছে।'--- তাতে চিকিৎসার দেরি হয়ে যায়।

২. হারপিস সিমপ্লেক্স— সোজা বাংলায় যাকে 'জ্বর ফোস্কা' বলা হয়—এই রোগের ফোস্কা সাধারণত মুখ বা নাকের ফুটোর আসে পাশেই বেরোয়। এর ভাইরাস কিন্তু আলাদা।

৩. কোনো কিছুর স্পর্শজনিত চামড়ার প্রদাহেও অনেক সময় ফোস্কা দেখা যায়।

চিকিৎসা

৪৮ ঘন্টার মধ্যে অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ খেলে খুব ভালো উপকার পাওয়া যায়। সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় অ্যাসাই-ক্লোভির নামে ওষুধ— পূর্ণবয়স্ক রোগীকে ৮০০ মিগ্রা করে চার থেকে পাঁচ বার খেতে বলা হয়। এছাড়া ভ্যালাসাইক্লোভির ও ফ্যামসাইক্লোভির নামক অ্যান্টি- ভাইরাল ওষুধ পাওয়া যায়। রোগ-প্রতিরোধ-ক্ষমতাহীন খুব খারাপ রোগীকে অ্যাসাইক্লোভির ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। এসব ওষুধগুলির কোনোটাই ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া নেবেন না।

এছাড়া ফোস্কার জায়গাতে ক্যালামাইন লোশন লাগালে ও ব্যথার ওষুধ খেলে কষ্টের একটু উপশম হয়। হারপিস জোস্টার পরবর্তী স্নায়ু বেদনে রোগীর কষ্ট খুব বেশি হলে উপশমের জন্য যে যে ওষুধগুলি ব্যবহৃত হয় তা হল—গাবাপেন্টিন, প্রিগাবালিন, ডক্সিপিন। এসব ওষুধও ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া খাবেন না।

চোখে এই রোগ হলে অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখেরও বিশেষ যত্ন নিতে হয়।

কুইজের উত্তর

১। প্রাণনাশ,অঙ্গহানি, কোনো গুরুতর শারীরিক প্রতিবন্ধকতার ভয় আছে এমন আঘাতের ক্ষেত্রে।

২। কেটামিন।

৩। ৩০ মিনিট।

৪। হেনরিয়েটা ল্যাকস নামে এক ক্যান্সার রোগীর শরীর থেকে গবেষণার জন্য প্রথম এই কোষ নেওয়া হয়েছিল, তাঁর নামের আদ্যক্ষর (HeLa) অনুযায়ী কোষটির নাম।

৫। ভিব্রিও কলেরি, কমা চিহ্নের মত, সেরোটাইপ-০১৩৯ কলেরার জীবাণু।

৬। প্রথমেই রোগীকে বরফ ঠান্ডা জলে চান করানো উচিৎ।

৭। রক্তের লোহিত কণিকা, প্লাসমোডিয়াম ভাইভাক্স ও প্লাসমোডিয়াম ওভেল নামক জীবাণু।

হেনরিয়েটা ল্যাকস

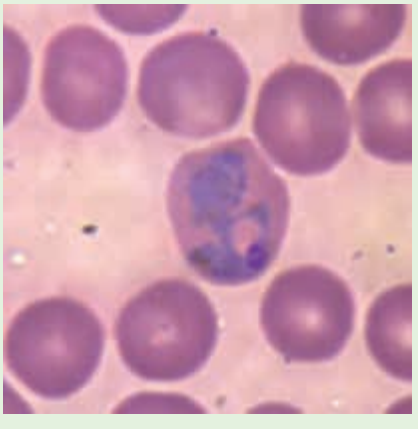

প্লাসমোডিয়াম ভাইভাক্স আক্রান্ত লোহিত রক্ত কণিকা

৮। 'সিকল সেল' রক্তাল্পতা।

৯। রিফাম্পিসিন ও আইসোনিয়াজাইড।

১০। ১৯৫৪ সালে ইউনিসেফ ও ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর চাইল্ড ওয়েলফেয়ার।

Unconventional.
Unstoppable.

A dermatology company like no other.

Innovative medical solutions
that meet the needs of dermatology
patients and physicians.

- Premier investor in dermatology research
- State-of-the-art global research and development
- Focus on therapeutic, corrective and aesthetic innovations

For further information, please write to
Galderma India Pvt. Ltd., 23, Steelmade Industrial Estate, 2nd Floor, Marol Village, Andheri (E), Mumbai - 400 059, India

GALDERMA
Committed to the future of dermatology
www.galderma.com

গর্ভাবস্থায় রক্তাল্পতা

এদেশে রক্তাল্পতা বা অ্যানিমিয়া অতি পরিচিত রোগ। মেয়েদের তো আমাদের দেশে সংসারে স্থান সবচেয়ে নীচে, তাই তাদের খাবার-দাবারের দিকে নজর দেওয়া হয় না, তাই রক্তাল্পতা প্রায় অনিবার্য। সেই মেয়ে যখন মা হতে চলে তখন তার রক্তাল্পতার ফলে দুটি প্রাণ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে— লিখছেন **ডা. অনিরুদ্ধ কর**।

রক্তাল্পতা, বিশেষত মেয়েদের মধ্যে ভীষণ বাড়ছে। ১৫ বছর বয়স অবধি মেয়েদের রক্তাল্পতা এখন বিশ্বে সবচেয়ে বেশি ভারতবর্ষে। গ্রাম ও শহরের মধ্যে গ্রামে বেশি ও দরিদ্র বিশেষ করে জনজাতি, উপজাতি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে তুলনায় অনেক বেশি।

এই রক্তাল্পতা আরো বেড়ে যায় গর্ভাবস্থায়, প্রসবের পরে ও স্তন্যদানের সময়। এটি একটি মারক ব্যাধি ও সময়ে ব্যবস্থা না নিলে প্রাণঘাতী হতে পারে, বিশেষ করে প্রসবকালীন বা প্রসবের পরে।

যে সমস্ত কারণে রক্তাল্পতা দেখা দেয় তার প্রধান কারণগুলি হল সুষম আহার না খাওয়া। কৃমি সংক্রমণ বিশেষ করে হুকওয়ার্ম সংক্রমণ যা খালি পায়ে মাঠে হাঁটার জন্য হয়— যেখানে মানুষ এখনো মাঠে মলত্যাগ করে। লৌহঘটিত খাবার যেমন গুড়, তাজা শাক-সব্জি, ছোলা, থোড়, মোচা ও ডিম বা যেকোনো মাছ বা মাংস খেলে রক্তাল্পতা কমানো যায়। গ্রামের গরিব মানুষ প্রতিদিন তাজা শাক-সব্জি, বাড়ির ডিম বা পুকুরের যেকোনো মাছ, গেঁড়ি-গুগলী খেয়ে এই মারক রোগ ঠেকাতে পারেন।

গর্ভাবস্থার শুরুতেই— তিন মাসের মধ্যে স্থানীয় উপকেন্দ্রে দিদিমণির কাছে গেলে উনি দেখে আয়রন বড়ি খেতে দেন। প্রতিদিন খাবার পরে একটি করে খেতে হবে। অনেকে ভয়ে যান না— মুখে বিস্বাদ লাগে বা পায়খানা কালো হয় বলে। অনেক শাশুড়ি মা, বিশেষত পুরুলিয়া জেলায় বড়ি খেতে বারণ করেন এই ভয়ে যে বাচ্চা বড় হবে ও প্রসবের সমস্যা হবে যা একেবারেই ভুল ধারণা।

গ্রামের মেয়েদের অনেক সময় মাসিকের সমস্যা থাকে বা সাদাস্রাব হয়। এজন্যও উপকেন্দ্রে দিদিমণির পরামর্শ নেওয়া উচিৎ। এগুলি থেকেও রক্তাল্পতাহ তে পারে।' সকলেরজ ন্যস্বাস্থ্য'এ ই ঘোষণার পরে সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচিতে গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার তৈরিতে সাহায্য করা পঞ্চায়েতের এক গুরুদায়িত্ব। এই কাজটি অনেক জেলাতেই তেমন ভালো হয় নি— যা হতে পারত। মাঠে মলত্যাগ করলে নানা ধরনের কৃমির সংক্রমণ গ্রামে বাড়তে থাকে যার মধ্যে হুকওয়ার্ম রক্তাল্পতার এক প্রধান কারণ। তাই এদিকে পঞ্চায়েতের যথাযথ নজর দিতে হবে। লাগাতার প্রচার চালাতে হবে।

পোয়াতি মা দুজনের খাবার খাবেন--- কারণ গর্ভকালে বাচ্চার সঠিক পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য ও মায়ের সুস্থ-সবল থাকার জন্য তা অতিজ রুরি।এ রজ ন্যদ ামি খাবার বা বাজার চলতি টনিক খাবার কোন দরকার নেই— সঠিক সুষম আহার গ্রহণ করলে ও দুবেলা ভরপেট খাবার খেলেই যথেষ্ট। খাবারের মধ্যে তাজা শাক-সব্জি থাকা অতি জরুরি।

রক্তাল্পতা নিবারণমূলক বা প্রতিরোধ যোগ্য। মায়ের স্বাস্থ্য ও খাদ্যের দিকে নজর রাখলে তা এড়ানো যায় কিন্তু এদিকে গাফিলতি করলে বা নানা সংস্কারের বশে নজর কম দিলে রক্তাল্পতার জন্য গর্ভস্থ শিশুর বৃদ্ধি, বুদ্ধির বিকাশ কম হয়। শিশু ও মাতৃমৃত্যুর এক অতি গুরুত্বপূর্ণ কারণ রক্তাল্পতা, কিন্তু তাকে ঠেকানো যায়।

মায়েরা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে এবং স্বাস্থ্য উপকেন্দ্রের দিদিমণির পরামর্শ গ্রহণ করবেন ও হাসপাতালেই প্রসবের জন্য প্রস্তুত হবেন। এজন্য জননী সুরক্ষা যোজনায় পাওয়া অর্থ ব্যয় করবেন। সুস্থ মা-ই সুস্থ শিশুর জন্ম দিতে পারে।

লেখক পরিচিতি: ডা. অনিরুদ্ধ কর, জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের কর্মী। রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদসহ বিভিন্ন প্রশাসনিক পদেও কাজ করেছেন।

উৎস মানুষ
বিজ্ঞান, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান :
বই-চিত্র (কফি হাউসের তিনতলা), পাতিরাম, বুক মার্ক, অমর কোলে (বিবাদি বাগ), দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়), র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন (বেনিয়াটোলা লেন, কলেজ স্ট্রিট), ডি আর সি এস সি ঢাকুরিয়া অফিস (দক্ষিণাপণ- এর উল্টোদিকে)। অম্লান দত্ত বুকস্টোর, বিধাননগর পৌরসভা— এফ ডি ৪১৫/এ। দে বুক স্টোর, কলেজ স্ট্রিট।
যোগাযোগ : ই-মেল- utsamanush1980@gmail.com
ফোন- ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/৯৮৩১৪৬১৪৫৬

ভারতীয় স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও ‘আমিরি’ বিপ্লব

আমির খান-এর ‘সত্যমেব জয়তে’—পপুলার কালচারের মোড়কে এমন এক ধাক্কা যা তাবড় বুদ্ধিজীবিকে নাকের উঁচু চশমা ফের এঁটে বসাতে বাধ্য করেছে। এই অনুষ্ঠানের চতুর্থ পর্বে ভারতীয় স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে দেখানো হয়েছে, চিকিৎসকদের সামাজিক সম্মানকে বিন্দুমাত্র রেয়াত না করে কাঠগড়ায় তোলা হয়েছে চিকিৎসা ব্যবস্থা ও মেডিকেল শিক্ষাব্যবস্থাকে। এবং শেষ পর্যন্ত একধরণের ‘বৈপ্লবিক’ সমাধান হাজির করা হয়েছে ‘ভালো’ ডাক্তারের মুখ-মুখোশের হাত ধরে। এটা কি সত্যিই নতুন কিছু, নাকি বেসরকারি পুঁজির বাজার দখলের জন্য প্রয়োজনীয় জনসম্মতি-নির্মাণ— প্রশ্ন তুলেছেন **ডা. প্রতীক দেব**।

ভারতীয় দূরদর্শনের ইতিহাসে বিশেষত সাম্প্রতিক অতীতে ‘সত্যমেব জয়তে’ নামক অনুষ্ঠানটির আগমন প্রায় এক যুগান্তকারী ঘটনা। গড়পড়তা আই পি এল, দশকের পর দশক চলতে থাকা টেলি ধারাবাহিক, অতিনাটকীয়তায় ভরপুর সিনেমা বা গেম শো-র পরিবর্তে এহেন অনুষ্ঠানের আগমন নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক সমস্যা বিষয়ক এই অনুষ্ঠানটি সম্ভবত এদেশে প্রথম যার নিজস্ব ওয়েবসাইট প্রথম এপিসোডটির সম্প্রচারের পর অত্যুৎসাহী দর্শনার্থীর চাপে ভেঙে পড়ে। একাধিক ভাষায় প্রচারিত এই অনুষ্ঠানটি মাত্র এক মাসে যে প্রবল উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে, বলা বাহুল্য তা চমকপ্রদ ও ঐতিহাসিক।

অনুষ্ঠানটির আপাত লক্ষ্য জনগণকে সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করা। অতিসরলীকৃত এই বয়ানটিকেস রিয়ে রখেয দিঅ ামরাঅ নুষ্ঠানটির দিকে চোখ রাখি তবে অবশ্য অন্য কিছু বিষয় চোখে পড়তে বাধ্য। প্রথমত, রিলায়েন্স, এয়ারটেল, অ্যাকোয়াগার্ড, প্রভৃতি কর্পোরেট হাউস এই অনুষ্ঠান প্রযোজনা করছে। তারা জানে যে ভারতবর্ষের মধ্যবিত্তের মধ্যে আজ এক প্রতিবাদের বাজার উপস্থিত। আন্না হাজারেকে নিয়ে মাস-মিডিয়ার আদেখলেপনা এবং লক্ষ লক্ষ উচ্চবিত্ত যুবক-যুবতী ও মহিলা পুরুষের উচ্ছ্বাস এই বাজারের উপস্থিতি প্রথমে টের পাওয়ায়। বহুজাতিক নিয়ন্ত্রিত বাজার অর্থনীতি বুঝতে পারে যে নিজেদের জীবনে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন না এনে গণমাধ্যম প্রদর্শিত কোনো এক বাজারি ‘বিদ্রোহী’র পিছনে দৌড়ানোর জন্য ভারতীয় মধ্যবিত্ত সমাজ তৈরি। এপিসোড পিছু তিন কোটি টাকা পারিশ্রমিক নেওয়া আমির বাজারে আসা নতুন বিদ্রোহী। এহেন বিদ্রোহীর আগমনে সমাজ-রাজনৈতিক বদলের বিন্দুমাত্র আশঙ্কা নেই। কারণ আপাদমস্তক দুর্নীতিতে নিমজ্জিত ভারতীয় মধ্যবিত্ত, বিশেষত, হিন্দি বলয়ের মধ্য-উচ্চবিত্ত যদি দুর্নীতি দমনের ডাক দিয়ে আন্দোলনে নামতে পারে তবে এই ‘আমিরি বিপ্লব’ তো কিছুই নয়। এ হল সমাজ-রাজনীতি বিমুখ ভারতীয় মধ্যবিত্ত (যারা শুধু স্বদেশীয় উন্নয়নের নয়া মুখইশু ধুন য়;স্বদেশেরব ৃহত্তরজ নগণেরড পর বহুজাতিক উপনিবেশ স্থাপনের প্রধান কান্ডারীও বটে) তাদের কিঞ্চিৎ মানসিক শান্তি লাভের ও নিজেকে মহান ভাবার সুযোগ করে দেওয়া।

তবে অনুষ্ঠানটির লক্ষ্য যদি এটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকত তো বিষয়টি মন্দ হত না। যদি অনুষ্ঠানটি ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের নিজস্ব কিছু কুপ্রথা যথা কন্যাভ্রূণ হত্যা বা জাতিভেদ প্রথা (যে সকল বিশেষত্ব ভারতীয় নব্য উদারনীতিবাদ নিজমধ্যে আত্তীকরণ করে নিয়েছে) প্রভৃতি বিষয়ে কথা বলত তাহলে বিষয়টি নিয়ে বিশেষ ভাবনা ছিল না। কিন্তু অনুষ্ঠানটির লক্ষ্য এই সামান্য বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকা নয়।

ভারতীয় স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিয়ে অনুষ্ঠানটি চতুর্থ পর্বে এক সুদীর্ঘ বক্তব্য রাখে। ‘বক্তব্য’ বলছি এই কারণে যে অনুষ্ঠানটির অভিমুখ শুধু সমস্যা অনুধাবনেই সীমাবদ্ধ থাকে নি; সেখানে ছিল সমাধান জানার প্রচেষ্টা বা আরও ভালোভাবে বললে সমাধান হিসাবে নির্দিষ্ট গতিপথ স্থির করে দেওয়ার ‘সদিচ্ছা’। কী সেই সমস্যা ও কী তার সমাধান যার পথ-নির্দেশ আমরাঅ ামিরেরক ছে থকে পাই?অ াসুন দেখা যাক—

স্বাস্থ্যব্যবস্থার আমির-সমস্যা

কিছু ব্যক্তির ভুল চিকিৎসা বা অপ্রয়োজনীয় শল্যচিকিৎসা করার ইতিবৃত্ত দিয়ে অনুষ্ঠানটির শুরু হয়। সেই সমস্ত ঘটনার সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন না তুলে এটুকু বলা যেতেই পারে যে বিষয়টি নতুন নয়। বহু বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে এহেন ঘটনা ঘটে এবং ঘটছে। প্রশ্ন হল কেন? আমিরের দেওয়া উত্তর কিছু অসৎ, লোভী চিকিৎসক। এই উত্তর পাঁচ বছরের শিশু ও আমিরের সামনে বসে থাকা উচ্চ-মধ্যবিত্ত যুবক-যুবতীকে সন্তুষ্ট করতে পারে; কিন্তু আসল

সত্য অনেক জটিল। ভারতবর্ষের স্বাস্থ্যব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান বেসরকারিকরণ ঘটেছে বিগত প্রায় দু-দশক ধরে। অসংখ্য বেসরকারি হাসপাতাল, নার্সিংহোম, প্যাথোলজি ল্যাব গজিয়েছে প্রায় ছত্রাকের মতো। স্বাস্থ্যব্যবস্থায় এই বিপুল বেসরকারি পুঁজি প্রাথমিকভাবে সহজে লাভবান হলেও বর্তমানে তা ভারতবর্ষের নগরকেন্দ্রিক স্বাস্থ্যব্যবস্থার বাজারকে প্রায় সম্পৃক্ত করে ফেলেছে। তাই ক্ষুদ্রতর বাজারে লড়াইতে নামা বৃহৎ সংখ্যক গোষ্ঠী তাদের ব্যবসার তাগিদে চালিয়ে যাচ্ছে সকল প্রকার আইনি বেআইনি পথের সুলুক-সন্ধান। প্রায় কর্পোরেট কায়দায় চলতে থাকা হাসপাতালের কর্মরত চিকিৎসকদের ধরানো হয় ডেড লাইন, টার্গেট। স্বাস্থ্য ব্যবসা অন্যতর ব্যবসা থেকে পৃথক নয়; হওয়ার কথাও নয়। তাই অন্য সবকিছু ছাপিয়ে মুনাফা আদায়ই হয়ে ওঠে প্রধানতম উদ্দেশ্য। কর্মরত চিকিৎসকেরা এই বৃহৎ চক্রের সামান্য অংশ মাত্র।

এরপর অনুষ্ঠানটি আরও অগ্রসর হয়। বিক্ষিপ্ত আলোচনায় এসে উপস্থিত হয় নানান সমস্যার কথা—স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে জাতীয় স্তরে ব্যয়বরাদ্দের অভাব, ছত্রাকের মতো গজিয়ে উঠতে থাকা পরিকাঠামোহীন মেডিকেল কলেজ, মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার দুর্নীতি— এ সবই একে একে উল্লিখিত হয়। উল্লিখিত হয় প্যাথোলজি ল্যাব বা পারস্পরিক রেফেরালের ভিত্তিতে চিকিৎসকদের কমিশন নেওয়ার কথা। বিক্ষিপ্তভাবে হলেও স্বাস্থ্যব্যবস্থার নানা সমস্যার কথা উঠে আসে। যদিও পূর্বাপর সমস্যাগুলির মতো এগুলিরও গভীরে গিয়ে কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয় না। বলা হয় না স্বাস্থ্য খাতে ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধি না করা আসলে এই ক্ষেত্রটিতে বহুজাতিক পুঁজির অনুপ্রবেশের পথ প্রশস্ত করার এক কৌশল মাত্র। অনুল্লিখিত থাকে বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তির শিথিলতা সহ অন্যান্য সরকারি 'সংস্কার'-এর কথা। বারংবার ডাক্তারি ছাত্রছাত্রীদের মেধার প্রসঙ্গ এলেও বলা হয় না সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তির বিষয়ে ব্যাপক গুণগত তারতম্যের প্রসঙ্গ।

অনুষ্ঠানের শেষাংশে এসে আমরা দেখলাম কেবলমাত্র সমস্যার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশেই সীমাবদ্ধ থাকতে চান না এই অনুষ্ঠানটির কর্তাব্যক্তিরা।

সমাধান—পুঁজির হৃদয়

এদেশে স্বাস্থ্যবিমার অভাবের প্রসঙ্গ আসতেই উল্লিখিত হল নির্মল হৃদয়ালয়ের বা নারায়ণ হৃদয়ালয়ের প্রসঙ্গ। ডা. দেবী শেঠীকে অতিথি হিসেবে এনে দীর্ঘ আলোচনায় প্রমাণ করার চেষ্টা চলল স্বাস্থ্যবিমার ক্ষেত্রেও পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপই একমাত্র উপায়। সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা বা ইউনিভার্সাল হেলথ কেয়ার মানুষের কাছে যে সকল দেশ সফল ভাবে পৌঁছে

দিয়েছে— যেমন ফ্রান্স, ইটালি, ইংল্যান্ড, জার্মানি, কানাডা, এমনকি গ্রিস বা কিউবাও যেভাবে স্বাস্থ্যব্যবস্থার সামগ্রিক জাতীয়করণের মাধ্যমেই এই দক্ষতা অর্জন করেছে সে কথা প্রকাশ না করে মার্কিনি কায়দায় সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবার নামে জনগণের অর্থ সরাসরি সরকারের মাধ্যমে বহুজাতিকের হাতে তুলে দেওয়ার প্রচেষ্টাকে মান্যতা দেবার নানা ছলাকলা চলতে থাকে। ওষুধ ব্যবসার দুর্নীতি, বহুজাতিক ও দেশিয় নানান ছোট বড় ওষুধ কোম্পানির বিস্তারিত জাল সম্পর্কে বিশেষ করে বলা হয় না। অনুষ্ঠানটির সাধারণ অভিমুখ মেনে চিকিৎসকদের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয় ওষুধ কোম্পানির থেকে নানারকম উৎকোচ উপহার গ্রহণের জন্য। অথচ ওষুধ বিক্রয়ের মুনাফার বিশাল মার্জিন; বৃহৎ ওষুধ কোম্পানিগুলির পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে জীবনদায়ী ওষুধের উচ্চমূল্য সৃষ্টি করে রাখা— এসব নিয়ে কোনো কথা বলা হয় না। সমস্ত নব্বইয়ের দশক জুড়ে কিভাবে একের পর এক সরকারি ওষুধ নির্মাণ প্রকল্পকে ধ্বংস করে ওষুধ শিল্পে বহুজাতিকের একচেটিয়া কারবারের পথ প্রশস্ত করা হয়েছিল তা এখনো আমাদের স্মৃতিতে। ভারতীয় ওষুধ ক্ষেত্রে পেটেন্ট আইনের সংস্কার (প্রসেস পেটেন্টের পরিবর্তে প্রোডাক্ট পেটেন্ট লাগু করার প্রচেষ্টা), বাজারে আসা নতুন ওষুধের দাম কিভাবে কয়েকশোগুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছে সে সব বিষয়েও আমরা যারা ওয়াকিবহাল তারা জানি— সমস্যাটি কিন্তু দুর্নীতিগ্রস্ত চিকিৎসক বা তাদের সদিচ্ছার অভাবের মধ্যেই কেবল সীমাবদ্ধ নয়। চিকিৎসকদের জেনেরিক নাম লেখা কিংবা সরকারি প্রচেষ্টায় 'জেনেরিক ওষুধ বিক্রয় কেন্দ্র' স্থাপনের মাধ্যমে ২০০৫ সালের পেটেন্ট আইন সংস্কারের (যার পিছনে রয়েছে WTO/TRIPS চুক্তির বাধ্যবাধকতা) প্রভাবকে পিছনে ফেলা যায় না। এড়ানো যায় না বাজার চলতি অসংখ্য অতি নিম্নমানের এমনকি ভেজাল ওষুধের সমস্যাকে। এদেশের অতি নিকৃষ্ট ড্রাগ কন্ট্রোল ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে যখন প্রথম বিশ্বের অসংখ্য নিষিদ্ধ ওষুধ এদেশের বাজার ছেয়ে ফেলে কিংবা নিকৃষ্ট মানের ওষুধ নির্মাণ করেও ওষুধ নির্মাতারা বছরের পর বছর স্বচ্ছন্দে ব্যবসা চালিয়ে যায়, তখন প্রশ্ন ওঠাটা স্বাভাবিক যে সামান্য ক'টি জেনেরিক ওষুধের দোকান এই বিপুল সমস্যা কিভাবে মোকাবিলা করবে?

জেনেরিক ঔষধালয় নতুন কিছু নয়; এখানে ব্র্যান্ড নেমের পরিবর্তে (যেমন অ্যাজিথ্রাল, অ্যাজো, অ্যাভজেথ, এ-জেক) ওষুধের প্রকৃত নাম (যথা অ্যাজিথ্রোমাইসিন ৫০০ মিগ্রা)-এর ভিত্তিতে কেনা বেচা চলবে। বলা বাহুল্য এই ব্যবস্থা নতুন নয়। সরকারি হাসপাতালে ওষুধের সরবরাহ ও বিতরণ এই ব্যবস্থার হাত ধরেই চলে। আর এর ফলও আমরা পাই হাতে নাতে। ওষুধের মান নিয়ন্ত্রক সংস্থার অপদার্থতা, আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি এবং রাষ্ট্রের সদিচ্ছার অভাবে সরকারি হাসপাতালে আসে অত্যন্ত নিম্নমানের ওষুধ। রোগী ও চিকিৎসক উভয়ের অভিজ্ঞতাতেই দেখা যায় যে এর মধ্যে অধিকাংশ ওষুধই আদৌ কাজ করে না। ফলত ওষুধের গুণগত মান নিয়ামক সংস্থার ব্যর্থতা চলতে থাকলে জেনেরিক ঔষধালয়-এর ব্যবস্থা যে আদৌ কিছু মাত্র সুবিধাজনক হবে না তা বলাই বাহুল্য।

'সম্মতি' নির্মাণ

সামগ্রিক ভাবে দেখলে 'সত্যমেব জয়তে' অনুষ্ঠানটি কেবলমাত্র বাজার চলতি সমস্যার ঢাক পিটিয়ে চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে কুৎসা গাওয়ায় আগ্রহী নয়। অনুষ্ঠানটি একটি নির্দিষ্ট প্রচার অভিমুখের দিশারীও বটে। ''কর্পোরেট

রেসপনসিবিলিটি"র গল্প শোনানো বেদান্ত বা অন্যান্য বহুজাতিকের সঙ্গে সুর মিলিয়ে এই অনুষ্ঠানটি মূলত যে বিষয়টিকে জনসমাজের কাছে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর তা হল রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় সামান্য সংস্কার ও কিছু ব্যক্তিমানুষের সদিচ্ছার উপর দাঁড়িয়ে সকল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। স্বাস্থ্যবিমা, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও ওষুধ বিতরণ ব্যবস্থাকে সংস্কার করতে যে সকল পথের উল্লেখ করা হয় তাদের প্রত্যেকটিই পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ-এর নানারকম মাত্রা। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রকে সংস্কার করতে যেন এর বাইরে কোনো পথ অবশিষ্ট নেই। এরপর যখন আমরা দেখি যে এই অনুষ্ঠানটিকে দেশের প্রত্যন্ততম এলাকায় নিয়ে গিয়ে প্রদর্শন করার ব্যাপারে গণমাধ্যম তথা বহুজাতিক সংস্থাগুলি বিশেষ তৎপরতা দেখাচ্ছে তখন প্রশ্ন ওঠে এই বিশেষ প্রচার পর্বের লক্ষ্য তাহলে কি? এটি কি শুধুই কিছু উচ্চ-মধ্যবিত্তের বিনোদন যোগানোর চাবিকাঠি, নাকি বহুজাতিকের নিজস্ব এজেন্ডাগুলিকে এদেশের একেবারে তৃণমূল স্তরের মানুষের কাছে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর এক ব্যবস্থাপনার জন্মদাতা? ভয় হয়, সাংস্কৃতিক জগতে অনুপ্রবেশের মাধ্যমে জনগণের সম্মতি আদায়ের যে গল্পটা আমরা ধনতন্ত্র সম্পর্কে চিরকাল শুনে আসছি সেই 'সম্মতি নির্মাণ' পর্ব কি তবে 'সত্যমেব জয়তে'র আমিরি বিপ্লবের হাত ধরে ভারতবর্ষের শেষতম মানুষটির কাছে পৌঁছে যাবে? গড়ে উঠবে বেসরকারি বিনিয়োগ ও বিনিয়োগকারির সদিচ্ছা বিষয়ে গভীর প্রত্যয় বোধ? ভারতীয় গ্রামসমাজ ও জনমানসে যে প্রাথমিক অবিশ্বাস বোধ থেকে শেষ পর্যন্ত জগৎসিংহপুরে পস্কো বিরোধী বা নন্দীগ্রামে সালিমগোষ্ঠী বিরোধী প্রতিরোধ গড়ে ওঠে, ভবিষ্যতে তা রুখতে চাওয়ার অতি-পরিশীলিত প্রক্রিয়া কি শুরু করে দিল এই 'আমিরি বিপ্লব'?

লেখক পরিচিতি: ডা. প্রতীক দেব, এম বি বি এস, বর্তমানে ক্লিনিক্যাল গবেষণার সঙ্গে যুক্ত। চিন্তাবিদ ও প্রাবন্ধিক।

advt.

স্বাস্থ্য খাতে খরচ

স্বাস্থ্য খাতে খরচ দিন দিন বেড়েই চলেছে। সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে জিনিসপত্রের দাম। নিত্য নতুন মারণ-রোগের কথা শোনা যাচ্ছে। তাদের মোকাবিলার জন্য দামি যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তি আমদানি করা হচ্ছে। ডাক্তারবাবুরা সেই সমস্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের প্রশিক্ষণ নিয়ে আসছেন। যন্ত্রের দাম, তার রক্ষণাবেক্ষণের খরচ, ডাক্তারবাবুদের ফি, তাঁদের প্রশিক্ষণের খরচ, যাঁরা যন্ত্রপাতি আনার খরচ বহন করছেন তাঁদের মুনাফা—এই সবকিছুই আসছে রোগীদের কাছ থেকে। ফলে রোগীর নাভিশ্বাস উঠবার অবস্থা। রোগী আর তার পরিবারের কাছে এই প্রশ্নটাই বারে বারে উঠে আসে, সত্যিই কি ওই সব পরীক্ষা আর চিকিৎসার প্রয়োজন ছিল? বিশেষ করে যখন তাঁরা দেখতে পান টাকা খরচ করেও অসুখ সারছে না কিংবা রোগীর কষ্টের লাঘব হচ্ছে না? লিখছেন **ডা. অসীম চ্যাটার্জি**।

স্বাস্থ্য খাতে ক্রমবর্ধমান খরচের প্রশ্নটা যে শুধু আমাদের দেশেই উঠছে এমন নয়। পৃথিবীর সব দেশেই স্বাস্থ্য খাতে ক্রমবর্ধমান খরচ একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বাস্থ্যখাতে অহেতুক বা অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা অথবা চিকিৎসা নিয়ে বিভিন্ন চিকিৎসক-গোষ্ঠি প্রমাণ-ভিত্তিক গাইড লাইন তৈরি করেছেন। এই রকমেরই একটা গাইড লাইন সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা। তাঁরা সাধারণ এবং বিভিন্ন স্পেশালিটির চিকিৎসার ক্ষেত্রে একটি তথ্য নির্ভর মূল্যবান গাইড লাইন দিয়েছেন, যা চিকিৎসক ও রোগী উভয়েরই জানা দরকার বলে মনে করি। আশা করব এটি রোগী ও ডাক্তারের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি দূর করতে সাহায্য করবে এবং ডাক্তারের উপর থেকে চাপ কমাতে সাহায্য করবে অহেতুক পরীক্ষা ও ব্যয়বহুল চিকিৎসা পদ্ধতি জোর করে রোগীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার দায় থেকে।

আমেরিকান অ্যাকাডেমি অফ ফ্যামিলি ফিজিশিয়ন-এর গাইড লাইন

১. কোমর ব্যথার জন্য প্রথম ৬ সপ্তাহের আগে এক্স রে বা সি টি স্ক্যান বা এম আর আই স্ক্যান করাবেন না। ফ্যামিলি ফিজিশিয়নদের কাছে প্রতি পাঁচ জন রোগীর একজন কোমরে ব্যথার সমস্যা নিয়ে আসেন। যদি সঙ্গে স্নায়ুঘটিত কোনো সমস্যা ক্লিনিক্যাল পরীক্ষায় লক্ষ্য করা যায় অথবা মনে হয় হাড়ে কোনো সংক্রমণ হয়েছে তবেই রোগীর ওই পরীক্ষাগুলো করলে রোগীর চিকিৎসায় কোনো উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে।

২. সাধারণ সাইনাসের অসুখের জন্য ৭ দিনের আগে অ্যান্টিবায়োটিক দেবেন না, যদি না প্রথমবারে দেখার সময় থেকে রোগীর অবস্থার অবনতি হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এটি ভাইরাল ইনফেকশনের জন্য হয় এবং নিজে থেকেই সারে।

৩. ৬৫ বছর বয়সের আগে মেয়েদের কিংবা ৭০ বছরের আগে ছেলেদের ডেক্সা স্ক্যান হাড়ের ক্ষয় নির্ণয় করার জন্য করবেন না যদি না অন্য কোনো বিশেষ নির্দিষ্ট কারণ থাকে। কম বয়সী লোকেদের ডেক্সা স্ক্যান করলে খরচের তুলনায় লাভের সম্ভাবনা নাম মাত্র।

৪. বার্ষিক ই সি জি বা হার্টের স্ক্রিনিং পরীক্ষা যেমন ইকোকার্ডিওগ্রাফি, অ্যাঞ্জিওগ্রাফি ইত্যাদি এমন লোকেদের যাদের কোনো হার্টের অসুখের লক্ষণ নেই, হার্টের অসুখের ঝুঁকি কম, তাদের করাবেন না। যাদের করোনারি আর্টারিতে স্টেনোসিস (রক্ত যাতায়াতের পথ সরু) অথচ কোনো হার্টের কষ্ট বা লক্ষণ নেই তাদের আগে স্টেনোসিস ধরা পড়লে তাদের চিকিৎসায় আরও ভালো ফল হয় এমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় নি, বরং অহেতুক বার্ষিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং ওষুধপত্রের ফলে উল্টোটাই ঘটছে এমন অনেক তথ্য রয়েছে।

৫. ২১ বছরের কম বয়সী মেয়েদের অথবা যাদের ক্যানসার নয় এমন অসুখের জন্য ইউটেরাস বাদ দিতে হয়েছে তাদের প্যাপ স্মিয়ার পরীক্ষা করাবেন না। বয়ঃসন্ধিকালে প্যাপ স্মিয়ারের যে সমস্ত ব্যতিক্রম দেখতে পাওয়া যায়, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো আপনা থেকেই ঠিক হয়ে যায়।

আমেরিকান অ্যাকাডেমি অফ অ্যালার্জি, অ্যাজমা এন্ড ইমিউনোলজি-র গাইড লাইন

১. অ্যালার্জির কারণ খোঁজার জন্য এমন সব পরীক্ষা করতে দেবেন না যেগুলো পরীক্ষিত এবং ফলপ্রসূ নয়; যেমন আইজি জি, নানা ধরনের আইজি ই। রোগীর সমস্যা ও লক্ষণ অনুযায়ী বিশেষ ধরনের আইজি ই পরীক্ষাই (রক্তের বা চামড়ার) তার অ্যালার্জির কারণ বার করতে সাহায্য করতে পারে ও পয়সার সাশ্রয় হয়।

২. সাধারণ সাইনাসের অসুখে, সাইনাসের সি টি স্ক্যান বা অ্যান্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করবেন না। যদি অ্যান্টিবায়োটিক দেবেন ঠিক করেন তো প্রথমে অ্যামোক্সিসিলিন দিয়ে শুরু করুন।

৩. ক্রনিক আর্টিকেরিয়া (আমবাত)-র চিকিৎসায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অ্যালার্জির কোনো নির্দিষ্ট কারণ পাওয়া যায় না। অনেক ল্যাবরেটরি পরীক্ষা করেও কোনো লাভ হয় না এবং পয়সার সদ্ব্যবহার হয় না।

৪. বারে বারে ইনফেকশন হচ্ছে এমন রোগীদের ইমিউনোগ্লোবিউলিন দিয়ে চিকিৎসা

করার সিদ্ধান্ত থেকে বিরত থাকবেন— যদি না নির্দিষ্ট প্রমাণ থাকে টিকা বা ভ্যাকসিন দিয়ে এদের শরীরে যথেষ্ট পরিমাণে অ্যান্টিবডি তৈরি হয় না যা অসুখ প্রতিরোধে সক্ষম।

৫. স্পাইরোমেট্রি ছাড়া অ্যাজমার ডায়গনোসিস বা চিকিৎসা করবেন না। শ্বাসকষ্টের অনেক কারণ রয়েছে এবং ভুল হতে পারে।

আমেরিকান কলেজ অফ ফিজিশিয়নস-এর গাইড লাইন

১. যাদের কোনো হার্ট-জনিত সমস্যা বা লক্ষণ নেই (আগামী ১০ বছরে হার্টের অসুখ হবার সম্ভাবনা ১০ শতাংশেরও কম) তাদের স্ক্রিনিং টেস্ট হিসাবে ট্রেড মিল টেস্ট বা টি এম টি করাবেন না।

২. সাধারণ কোমরে ব্যথায় সিটি, এম আর আই, এক্স রে করাবেন না।

৩. হঠাৎ করে অজ্ঞান হয়ে পড়ার ইতিহাস রয়েছে কিন্তু স্নায়ুতন্ত্রের ক্লিনিক্যাল পরীক্ষায় কোনো অসুবিধা পাওয়া যায় নি— এসব ক্ষেত্রে ব্রেনের সিটি, এম আর আই স্ক্যান করাবেন না।

৪. যাদের পায়ের শিরাতে রক্ত জমাট বাঁধার সম্ভাবনা কম, তাদের পায়ে ডপলার প্রভৃতি পরীক্ষা করার আগে রক্তে ডি ডাইমার পরীক্ষা করবেন। এটি তুলনামূলক কম খরচের এবং যারা ডি ডাইমার নেগেটিভ তাদের পায়ে রক্ত জমাট বাঁধার সম্ভাবনা খুব কম।

৫. প্রতিটি অপারেশনেরই আগে নিয়ম করে বুকের এক্স রে করার প্রয়োজন নেই। কেবলমাত্র যাদের হার্ট বা ফুসফুসের সমস্যা রয়েছে তাদেরই এক্স রে করানো উচিত।

আমেরিকান গ্যাস্ট্রোএনটেরোলজিকাল অ্যাসোসিয়েশন-এর গাইড লাইন

১. অ্যাসিডিটি উদগার (জি আর ডি) চিকিৎসায় যেখানে অনেকদিন ধরে প্যান্টোপ্রাজল, র‍্যানিটিডিন প্রভৃতি ওষুধ ব্যবহার করতে হয়, সেখানে সব থেকে কমমাত্রার কার্যকরী ওষুধ ব্যবহার করবেন।

২. যার কোলন ক্যানসারের বাড়তি ঝুঁকি নেই তার ক্যানসার স্ক্রিনিং-এর জন্য ১০ বছর অন্তর কোলনোস্কোপি করানো যেতে পারে।

৩. যার কোলনে একটি বা দুটি পলিপ পাওয়া গিয়েছে, তাদের সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হয়েছে এবং বায়োপ্সি করে দেখা গেছে কোষের আকৃতির বিচ্যুতি বেশি নয়, তাদের পাঁচ বছরের আগে ফের কোলনোস্কোপি করার প্রয়োজন নেই।

৪. ব্যারেটস ইসোফেজাইটিসে সেখানে কোষের বিচ্যুতি ঘটে নি সেখানে তিন বছরের আগে এন্ডোস্কোপি করার প্রয়োজন নেই।

৫. যদি কোনো রোগীর পেটের ব্যথার কারণ মানসিক বলে মনে হয় তাহলে পেটের সিটি স্ক্যান করবার দরকার নেই— যদি না তার সমস্যার কোনো হঠাৎ করে কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটে থাকে।

আমেরিকান কলেজ অফ ক্লিনিক্যাল অনকোলজি

১. সলিড টিউমার (প্যানক্রিয়াস, লিভার, লাংস, স্টমাক প্রভৃতি) ক্যানসারে এইসব ক্ষেত্রে ক্যানসার নির্মূল করার উদ্দেশ্যে চিকিৎসা দেবেন না ঃ রোগী যেখানে গুরুতর ভাবে অসুস্থ (নিজের দেখাশোনা করতে নিজে অসমর্থ, বেশির ভাগ সময় বিছানায় বসে বা শুয়ে থাকে, বা শারীরিক অবস্থার

হঠাৎ করে অজ্ঞান হয়ে পড়ার ইতিহাস রয়েছে কিন্তু স্নায়ুতন্ত্রের ক্লিনিক্যাল পরীক্ষায় কোনো অসুবিধা পাওয়া যায় নি— এসব ক্ষেত্রে ব্রেনের সিটি, এম আর আই স্ক্যান করাবেন না।

অবনতির জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা প্রয়োজন); কোনো তথ্য প্রমাণ নেই আগে ওই ধরনের চিকিৎসায় রোগীর উন্নতি হয়েছে; নতুন কোনো কেমোথেরাপি ট্রায়ালের জন্য রোগী উপযুক্ত নয়; বা কোনো তথ্য প্রমাণ নেই যে ক্যানসার চিকিৎসা চালিয়ে গেলে রোগীর লাভ হবে। এসব ক্ষেত্রে বরং কষ্ট লাঘব করার জন্য ও সুস্থ থাকার জন্য চিকিৎসা চালিয়ে যান।

২. প্রথমবার প্রস্টেট ক্যানসারের ক্ষেত্রে ব্যয়বহুল পেট (পি ই টি), সিটি বা রেডিও নিউক্লিয়াইড স্ক্যান করাবেন না। এই পরীক্ষাগুলি কিছু বিশেষ ধরনের ক্যানসারের জন্যই নির্দিষ্ট রাখা উচিত যারা দ্রুত ছড়ায়। লো রিস্ক ক্যানসারের ক্ষেত্রে প্রথম অবস্থায় এই পরীক্ষাগুলি ব্যবহার করে বাড়তি সুরক্ষা পাওয়া গেছে এমন তথ্য নেই।

৩. একই ভাবে যেসব স্তনের ক্যানসার দ্রুত ছড়ায় না সেখানে প্রথমেই ক্যানসারের স্টেজ নির্ণয় করার জন্য পেট, সিটি বা রেডিওনিউক্লিয়াইড স্ক্যান করে বাড়তি সুরক্ষা পাওয়া গেছে এমন তথ্য নেই। উপরন্তু এগুলি ক্ষেত্র বিশেষে ক্ষতিকর হতে পারে।

৪. স্তনের ক্যানসারের ক্ষেত্রে— যারা ক্যানসার নির্মূল করার উদ্দেশ্য নিয়ে চিকিৎসা পেয়েছে, তাদের যদি কোনো লক্ষণ না থাকে, ক্যানসারের পুনরাক্রমের হদিশ পেতে নিয়মিত স্ক্যান বা বায়োমার্কার পরীক্ষার প্রয়োজন নেই। এগুলি প্রধানত কোলন, ওভারি প্রভৃতি ক্যানসারের ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়।

৫. কেমোথেরাপির দরুন রক্তে শ্বেত কণিকা কমে যাবার ফলে ইনফেকশনের সম্ভাবনা (ফেব্রাইল নিউট্রোপিনিয়া) যে সব ক্ষেত্রে ২০ %-এর কম সেখানে শ্বেত কণিকা বাড়াবার ইঞ্জেকশন (ফিলগ্রাস্টিম) দেবেন না, যদি না রোগীর অন্য কোনো শারীরিক প্রতিবন্ধকতা যেমন বেশি বয়স্ক, হার্টের অসুখ বা ওই রকমের কিছু সমস্যা থাকে।

আমেরিকান সোসাইটি অফ নেফ্রোলজি

১. ডায়ালিসিস চলা রোগীর জন্য লক্ষণ না থাকলে রুটিন ক্যানসার স্ক্রিনিং পরীক্ষা করাবেন না, যেমন ম্যামোগ্রাফি, কোলোনোস্কোপি, পি এস এ, এবং প্যাপ স্মিয়ার—যদি না তাদের কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট করার কথা চিন্তা করা হচ্ছে। ট্রান্সপ্লান্ট ব্যতীত ডায়ালিসিস রোগীর আয়ু দীর্ঘ সময়ের হয় না এবং সেখানে এই ধরনের পরীক্ষায় বাড়তি লাভ হয় না।

২. ক্রনিক কিডনির অসুখে ১০ গ্রাম % বা তার বেশি হিমোগ্লোবিন থাকলে, হিমোগ্লোবিন বাড়াবার জন্য (ই এস এ বা এরিথ্রোপোয়েসিস স্টিমুলেটিং এজেন্ট) ইঞ্জেকশন দেবেন না। এতে চিকিৎসার দিক থেকে বা রোগীর দিক থেকে বাড়তি লাভ নেই অথচ স্ট্রোক হবার সম্ভাবনা বাড়ে।

৩. ক্রনিক কিডনির অসুখে ব্যথার ওষুধ খাওয়াবেন না বা ইঞ্জেকশন দেবেন না, এতে দ্রুত কিডনির বা হার্টের বা ব্লাডপ্রেশারের অবনতি হয়।

৪. ক্রনিক কিডনির অসুখে নেফ্রোলজিস্টের পরামর্শ ছাড়া ড্রিপ চালাবেন না। ড্রিপ দেবার ফলে শিরাগুলো নষ্ট হয়ে গেলে পরে ডায়ালিসিসের সময় অসুবিধা হতে পারে।

৫. রোগী, তার বাড়ির লোক এবং ফ্যামিলি ফিজিশিয়নের সঙ্গে ভালোভাবে আলোচনা না করে ডায়ালিসিস করার সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেবেন না।

আমেরিকান কলেজ অফ কার্ডিওলজি

১. প্রথম পরীক্ষাতেই হার্টের বিভিন্ন ইমেজিং

প্রথম পরীক্ষাতেই হার্টের বিভিন্ন ইমেজিং ইত্যাদির নির্দেশ দেবেন না— যদি না রোগীর কষ্ট ও লক্ষণসমূহ এবং বিভিন্ন ধরনের রিস্ক ফ্যাকটার থেকে থাকে। ৪৫ % অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষার খরচ এই ধরনের নির্দেশের জন্যই হয়ে থাকে যা থেকে চিকিৎসক এবং রোগীদেরও বিরত থাকা দরকার।

ইত্যাদির নির্দেশ দেবেন না— যদি না রোগীর কষ্ট ও লক্ষণসমূহ এবং বিভিন্ন ধরনের রিস্ক ফ্যাকটার (যেমন ৪০ বছরের বেশি বয়স্ক ডায়াবেটিস রোগী অথবা যাদের প্রতি ১০ বছরে হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা ২০ %-এর বেশি) থেকে থাকে। ৪৫ % অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষার খরচ এই ধরনের নির্দেশের জন্যই হয়ে থাকে যা থেকে চিকিৎসকদের (এবং রোগীদেরও) বিরত থাকা দরকার।

২. প্রতি বছর রুটিনমাফিক হার্টের ইমেজিং পরীক্ষা বা সিটি, অ্যাঞ্জিও ইত্যাদি যাদের হার্টের সমস্যা বা লক্ষণ নেই তাদের করাবেন না।

৩. অপারেশনের আগে সেই সব রোগীর রুটিন হার্টের ইমেজিং, টি এম টি বা ট্রেস ইকোকার্ডিওগ্রাফি ইত্যাদি করাবেন না যাদের হার্টের সমস্যা বা কষ্ট নেই এবং অপারেশনের ঝুঁকি কম।

৪. জন্মগত অল্প হার্টের ভালভের দোষ আছে এবং তার জন্য সমস্যা নেই এমন লোকের নিয়মিত ইকোকার্ডিওগ্রাফি করাবেন না।

৫. যে ধমনীর বদ্ধতার জন্য হার্ট অ্যাটাক হয়নি এবং হার্টের কার্যকারিতা যেখানে ঠিক রয়েছে সেই ধমনীতে স্টেন্ট পরাবেন না। এতে চিকিৎসাজনিত সমস্যা ও মৃত্যুহার বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সম্পাদকীয় সংযোজন— বুদ্ধিমান পাঠক লক্ষ্য করেছেন যে চিকিৎসার এইসব গাইডলাইন কিন্তু কোনোটাই এদেশের নয়, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের। সে দেশে ডাক্তাররা রোগীর ওপর আমাদের দেশের তুলনায় বেশিই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফরমায়েশ করেন। সেদেশে যেসব জায়গায় পরীক্ষা করানো অপ্রয়োজনীয় বলা হচ্ছে সেগুলো আমাদের দেশে প্রয়োজনীয় হবার বাস্তব সম্ভাবনা খুবই কম।

এখন পাঠকের কাছে বড় সমস্যা হল, নিজের বা কোনো নিকট-জনের রোগ নিয়ে যখন তাঁরা ডাক্তারবাবুর কাছে যাবেন, তখন তাঁরা হয়তো দেখবেন যে রোগটি ওপরের কোনো একটি গাইড লাইনে বর্ণিত একটি রোগের মতোই— যেমন কোমর ব্যথা বা সাধারণ সাইনাস অসুখ। সেক্ষেত্রে যদি পাঠক দেখেন ডাক্তারবাবু এই গাইড লাইনের চাইতে বেশি পরীক্ষা বা ওষুধের ফর্দ ধরাচ্ছেন, তাহলে ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করুন সেটার প্রয়োজনীয়তা কোথায়। হয়তো সত্যিই কোনো প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, যেমন সাধারণ সাইনাস অসুখের অবনতি ঘটেছে বুঝেই ডাক্তারবাবু অ্যান্টিবায়োটিক দিয়েছেন। আবার এ-ও হতে পারে যে ভারতের চিকিৎসকদের কোনো একাডেমিক সংগঠন যে গাইড লাইন দিয়েছেন সেটি আমেরিকার গাইড লাইনের চাইতে আলাদা। সে সব ক্ষেত্রে ডাক্তারবাবু আপনাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলে দেবেন।

আবার কিছু ক্ষেত্রে হয়তো বা ডাক্তারবাবু গাইডলাইনটির সঙ্গে সেরকম পরিচিত নন বা সেটার কথা তাঁর মাথায় আসে নি—সেক্ষেত্রেও সমস্যা কিছু নেই, একজন বিজ্ঞানমনস্ক ডাক্তার সব সময়ে শিখবার জন্য তৈরি থাকেন—এমনকি তাঁর রোগীদের কাছ থেকেও। সুতরাং কথা বলতে ভয় পাবেন না, ভদ্রতার সঙ্গে যথাযথ প্রশ্ন তোলাটা অনুচিত নয়, ডাক্তারবাবুকে অসম্মান করা তো নয়ই। — সম্পাদক, **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**।

লেখক পরিচিতি: ডা. অসীম চ্যাটার্জী এম বি বি এস, এম ডি, জেনারেল মেডিসিনে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন। লেখক ও প্রাবন্ধিক, চিকিৎসাসংক্রান্ত বিষয়ে এবং মানবিক সমস্যা ও মূল্যবোধ নিয়ে তাঁর লেখা বহু প্রবন্ধ ও কিছু বই রয়েছে।

advt.

এখন **দুর্বার ভাবনা** পাওয়া যাচ্ছে

শিলিগুড়িতে বুকস, কুচবিহারে পার্থ লাহিড়ী, এন এইচ রোড, নবদ্বীপের পোড়ামাতলায় সুজয়া প্রকাশনী পশ্চিম মেদিনীপুরের ভূর্জপত্র (বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি রোড), শান্তিনিকেতনে সুবর্ণরেখা।

কলকাতায়

হাওড়া স্টেশন (কলকাতা বাসস্ট্যান্ড, হাওড়া বাসস্ট্যান্ড), শিয়ালদহ স্টেশন (সানশাইন বুকস্টল, রামকৃষ্ণ পুস্তকালয় ও অন্যত্র), কলেজ স্ট্রিট (পাতিরাম, বুকমার্ক, মণীষা গ্রন্থালয়, বইচিত্র ও অন্যত্র)।

রাসবিহারী মোড়, ফুলবাগান (বেলেঘাটা), হাতিবাগান, শ্যামবাজার (পাঁচমাথার মোড়), ঢাকুরিয়া (দক্ষিণাপণের বিপরীতে), বইকল্প (দোতলায়), বিধাননগর (উল্টোডাঙা) স্টেশন ও অন্যত্র।

যাঁরা পত্রিকার এজেন্সি নিতে চান এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন— ১২/৫ নীলমণি মিত্র স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৬।

অথবা ফোন করুন ০৮৪২০০৬৬৫৯৪ অথবা ০৩৩২৫৪৩৭৫৬০।

সরকারি ও বেসরকারি চিকিৎসা পরিষেবা— আমাদের জন্যে

শরীর খারাপ হলে কোথায় যাবেন? সরকারি হাসপাতাল—সেই অফিস টাইমের শিয়ালদা স্টেশনের মত ভিড়, কুকুর বিড়াল ঘুরছে বিছানার চারপাশে। এখানে চিকিৎসা হয় নাকি! তাহলে চলুন বাইপাসের ধারে হাসপাতালে—চিকিৎসার স্বর্গরাজ্য! সরকারি আর বেসরকারি হাসপাতালের ফারাকটি কি এরকম না অন্যকিছু? জানাচ্ছেন **ডা. দেবীপ্রসন্ন ঘোষাল**।

আমরা আজকাল সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার বেহাল দশার কথাই সংবাদ মাধ্যমে দেখতে পাই। পাশাপাশি বেসরকারি হাসপাতালের প্রতিনিয়ত পাতাজোড়া রংবেরঙের বিজ্ঞাপন জানিয়ে দেয় আধুনিক চিকিৎসা একমাত্র বেসরকারি প্রতিষ্ঠানেই সম্ভব। এর মধ্যে পড়ে আজ দ্বিধাগ্রস্ত মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজ। আমি এই নিবন্ধে চেষ্টা করছি আমার দেখা চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রকৃত চিত্রটি তুলে ধরার।

রোগের আর্থসামাজিক অবস্থান

স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত বিশ্লেষণীতে আর্থ-সামাজিক দিক অনুযায়ী রোগের ধরন-ধারন ও তার চিকিৎসা ব্যবস্থার কথা বলতেই হবে। উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির মধ্যে রোগের প্রকারভেদ কিছুটা হলেও আছে, যেমন হার্টের অসুখ, বিলাসিতা সংক্রান্ত মানসিক অসুখ উচ্চবিত্তদের শিরঃপীড়ার কারণ, অন্যদিকে সংক্রমণ জনিত রোগ (যেমন ডায়রিয়া, হেপাটাইটিস ইত্যাদি) নিম্নবিত্তদের কষ্টের কারণ। মধ্যবিত্তসমাজ কিন্তু দুটোতেই সমানভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনায় জর্জরিত। তারই সঙ্গে আছে পথ দুর্ঘটনায় আহত হবার সম্ভাবনা যা আমাদের সমাজের মাঝারি ও ইয়ং গ্রুপের এক বড় সমস্যা। কর্কটরোগ বয়স্কদের মৃত্যুর একটা বড় কারণ কিন্তু আজকাল এই রোগের প্রাদুর্ভাব মাঝবয়সি ও তরুণ সমাজকেও যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

এককথায় বলতে গেলে রোগের গতিপ্রকৃতি যেমন বদলেছে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে অনেক রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও দামি ওষুধপত্রের ব্যবহারে চিকিৎসা বেশ ব্যয়বহুল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থা

আসি সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার কথায়। এই চিকিৎসা ব্যবস্থা অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মতভাবে ত্রিস্তরে বিভক্ত— প্রাইমারি (primary), সেকেন্ডারি (secondary) এবং টার্সিয়ারি (tertiary) স্তরের হাসপাতাল। গ্রামীণ হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইত্যাদি পড়ে প্রথমটিতে, মহকুমা ও জেলা হাসপাতাল পড়ে দ্বিতীয়টিতে আর মেডিকেল কলেজগুলি পড়ে তৃতীয়টিতে।

প্রাইমারি কেয়ারে মূলত গ্রামের মানুষ চিকিৎসা নেন। জ্বর, সর্দি-কাশি, পেটের অসুখ থেকে কলেরা, যক্ষ্মার চিকিৎসা এখানে হয়। প্রাথমিক স্তরে যাদের চিকিৎসা সম্ভব নয় তাদেরকে পাঠানো হয় দ্বিতীয় স্তরে। তারপর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজন মত পাঠান হয় তৃতীয় স্তর বা টার্সিয়ারি কেয়ার হাসপাতালে। টার্সিয়ারি কেয়ারে যেকোন জটিল রোগের চিকিৎসা সম্ভব। এছাড়া জরুরি (emergency) এবং পরিকল্পিত (planned) যে কোন অস্ত্রোপচার এই হাসপাতালে হয়। আগে হত না এমন কিছু জটিল অস্ত্রোপচার— বাইপাস সার্জারি, অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি, ট্রান্সপ্লান্ট অপারেশন এগুলোও ধীরে ধীরে শুরু হয়েছে। কিন্তু সর্বোচ্চ স্তরের চিকিৎসা-ব্যয় এর আছে। হয়ত এই মুহূর্তে সবটা ফ্রি (free) করা সম্ভব নয়।

কোন সন্দেহ নেই গঠনতন্ত্র এবং কি কি পরিষেবা দেওয়া যায় তার নিরিখে সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থা খুবই বিজ্ঞানসম্মত। কিন্তু প্রত্যেক স্তরে যে সংখ্যক রোগীর চাপ তা সামাল দেবার মতো পরিকাঠামো এখনও গড়ে তোলা সম্ভব হয় নি।

বেসরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থা

ক্রমবর্ধমান রোগীর চাপ, তুলনায় সরকারি ব্যবস্থার অপ্রতুলতা আর বিজ্ঞাপনী চমকে গত তিন দশকে মহামারীর মত ছড়িয়ে পড়েছে এই চিকিৎসা ব্যবস্থা। এই চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রাথমিক শর্ত হল বাণিজ্যিক দিকটি পরিপূর্ণ করার পাশাপাশি সর্বাধুনিক চিকিৎসা দেওয়া। এককথায় স্বীকার করতে দ্বিধা নেই বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা আধুনিক এবং অনেক কিছুই হয় যেগুলি সরকারি হাসপাতালে হয় না। যেহেতু সমগ্র দেশের মানুষের কাছে চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে যাওয়ার কোন দায়বদ্ধতা নেই আর হাসপাতালগুলি মূলত কিছু বৃহৎ ব্যবসায়ী পরিচালিত তাই বেসরকারি হাসপাতালগুলি সরকারি হাসপাতালের টার্সিয়ারি রূপের চেয়ে আরো আধুনিকভাবে সজ্জিত, আর আছে জনমোহিনী রূপ। সাধারণভাবে কোন মানুষ চান না তার অসুস্থ প্রিয়জনের শারীরিক কষ্টের সময় কোনও মানসিক কষ্ট হোক। এখানেই বেসরকারি হাসপাতাল এগিয়ে।

সরকারি বনাম বেসরকারি—একটি উদাহরণ

ধরা যাক অ্যাপেনডিসাইটিস নিয়ে একটি সরকারি হাসপাতালে এমার্জেন্সি বিভাগে এক রোগী গেল। প্রথম অভিজ্ঞতা একজন জুনিয়র ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করলেন। সাধারণত কি হয়? একটি মধ্যবিত্ত বাড়ির কারোর অসুখ করলে এবং তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে শুনলেই অত্যুৎসাহীরা সাহায্যের (!) হাত বাড়িয়ে দেন। ফলত একজন রোগীর দেখার সময় একজন ডাক্তারকে অন্তত চার পাঁচজন ভিন্ন মানসিকতার মানুষের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়।

জুনিয়র ডাক্তারটির কথাবার্তা হয়ত অনেক সময়ই সকলের মনের মত হয় না। এছাড়া আছে পরিকাঠামোগত সমস্যা। যেমন ওই রোগী/রোগিনীকে এমার্জেন্সি থেকে ওয়ার্ডে পৌঁছাতে অনেক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়— স্ট্রেচার/ট্রলি পাওয়া যাবে না— পাওয়া গেল তো নিয়ে যাওয়ার লোক পাওয়া গেল না। সব বাধা পেরিয়ে রোগী যখন ওয়ার্ডে পৌঁছাল—সেখানে জৌলুষহীন বিছানার চাদরে, আশপাশে সিরিয়াস রোগীদের মাঝে শুয়ে সে ভয় পেতে বাধ্য। কেব্‌ল টিভি, যেটা ছাড়া আধুনিক মধ্যবিত্ত জীবন অচল, সেসবের কথা তো ভাবাই যায় না। এরপর চিকিৎসা, অস্ত্রোপচার সিনিয়র ডাক্তার দ্বারা। তারপর ওয়ার্ডে রোগীর বাড়ির লোকের যত্রতত্র আনাগোনা এবং বাধাপ্রাপ্ত হলেই মনক্ষুণ্ণতা—যার বহিঃপ্রকাশ 'আমার রোগীকে ঠিকমত দেখা হচ্ছে না।'

এই একই রোগের রোগীর বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা পাশাপাশি দেখে নেওয়া যাক। ওই রোগী যখনই হাসপাতালে পৌঁছাবে একজন উর্দি পরা ওয়ার্ড বয় ট্রলি নিয়ে অপেক্ষমান। গদিওয়ালা ট্রলিতে তিনি এমার্জেন্সিতে যাবেন, সেখানে একজন দু'জন নিকটাত্মীয় ছাড়া কারো প্রবেশাধিকার নেই। এবার এমার্জেন্সি চিকিৎসক দেখে রোগ সম্পর্কে বাড়ির লোককে অবগত করার পর ভর্তির পালা। রোগীকে ভর্তি করতে গেলেই একটা থোক টাকা জমা দিতে হবে সুসজ্জিত রিসেপশন ডেস্কে। এরপর রোগীকে সুসজ্জিত ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হবে যেখানে পৌঁছানোমাত্র ওয়ার্ড নার্স তাকে সযত্নে পরিপাটি করা বিছানায় শুইয়ে দেবেন। চিকিৎসা শুরু করবেন আর. এম. ও. (R.M.O.)। রোগীর চারপাশ দামি পর্দামোড়া যে জন্য পাশের রোগীর সঙ্গে চাক্ষুষ হওয়ার সম্ভাবনা কম। আছে কেব্‌ল টিভি যাতে দেখা যাচ্ছে আই. পি. এল. ক্রিকেট বা সিনেমা। এই পরিস্থিতিতে রোগী স্বভাবতই স্বচ্ছন্দ। ওয়ার্ডে নির্দিষ্ট সময় ছাড়া বাড়ির লোকের আনাগোনা নেই। এরপর অস্ত্রোপচার হবে আধুনিক অপারেশন থিয়েটারে অন-কল সার্জেন দিয়ে।

আপনি কোন জায়গাটা পছন্দ করছেন? আমি তো অবশ্যই দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠানটিকে।

এরপর আসি ভেতরের কথায়। ধরা যাক ওই রোগীরই অপারেশনের পরবর্তী কোন জটিলতা হল। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সেই শল্যচিকিৎসককে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করবেন কিন্তু তখন হয়ত তিনি অন্য কোনখানে অন্য কোন অপারেশনে ব্যস্ত। তাই তিনি প্রয়োজনীয় নির্দেশ ফোনেই দেবেন— যেটা পালন করবেন কর্তব্যরত নার্স ও জুনিয়র ডাক্তার। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয়ত জুনিয়র ডাক্তার সার্জারিতে শিক্ষণপ্রাপ্ত নন। একই পরিস্থিতিতে সরকারি হাসপাতালে ওই রোগীকে দেখবেন অন কল ডাক্তার যিনি কিন্তু সার্জারিতেই উচ্চ শিক্ষা পেতে সচেষ্ট ছাত্র বা সার্জারির হাউসস্টাফ। তার কোন অসুবিধা হলে হাসপাতালে উপস্থিত মিডল টায়ারের এমার্জেন্সি সার্জেনের সাহায্য নিতে পারবেন। এই দু'জনের মিলিত প্রয়াসে কিন্তু অনেক জটিল পরিস্থিতির সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব হয়।

এবার মুদ্রার অন্যদিকটি দেখা যাক। ধরা যাক চিকিৎসার পরেও কোন রোগীর জীবনহানি হল। বেসরকারি হাসপাতালে প্রথমে রোগীর খরচের বিলটি মেটাতে হবে। তাহলেই মৃতদেহ সুসজ্জিত কফিনবন্দি করে আত্মীয়দের হাতে তুলে দেওয়া হবে—আর তা বেরোবে দ্বিতীয় বা তৃতীয় জায়গা দিয়ে কখনই মূল প্রবেশদ্বার দিয়ে নয়। আর সরকারি হাসপাতালে? — কর্তব্যরত জুনিয়র ডাক্তার ডেথ সার্টিফিকেট সই করবেন, সেটি কাউন্টার সাইন করবেন তার উপরের মিডল টায়ারের ডাক্তার। ততক্ষণে অপেক্ষমান মুষড়ে পড়া বাড়ির লোক অধৈর্য এবং পাড়ার শুভানুধ্যায়ীরা চড়াও ডাক্তারের উপর— কেন এমন হল? জুনিয়র ডাক্তার চেষ্টা করবেন সাধ্যমত বোঝানোর, কিন্তু এই স্পর্শকাতর বিষয়টিতে বোধহয় কেবলমাত্র অভিজ্ঞ কাউন্সেলর পারেন ক্ষতে প্রলেপ দিতে। তাই যা হওয়ার তাই হয়— মারধোর, ভাঙচুর ইত্যাদি।

মধ্যবিত্ত দোলাচল

বিভিন্ন কারণে চিকিৎসা আজ প্রায় পণ্যে পরিণত হয়েছে। যেমন বেশি দাম দিলে বেশি ভালো কাপড় জামা কেনা যায় অনেকটা সেরকম। যদিও চিকিৎসা কখনই তা নয় এবং তা হওয়া উচিতও নয় যেহেতু এর বিজ্ঞান আলাদা, মানবিক দিকও আলাদা। সরকারি হাসপাতালে নেই আধুনিক চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত বাণিজ্যিক মোড়ক আবার উল্টোদিকে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে আছে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার মধ্যে সম্মোহনী দৃষ্টি-আকর্ষক বাণিজ্যিক মোড়ক। তাই মধ্যবিত্ত মন অনেক ক্ষেত্রেই সাধ্যের অতীত হলেও ছোটে ঝাঁ-চকচকে বেসরকারি হাসপাতালে। আর প্রায়শই রোগমুক্ত হতে গিয়ে হয়ে পড়ে ঋণযুক্ত। কিন্তু সরকারি বেসরকারি দোলাচল থেকে আশুমুক্তির উপায় মধ্যবিত্তের নেই।

সবশেষে বলি পাঠকগণ আশাকরি বুঝতে পারছেন কেন বিজ্ঞানসম্মত হওয়া সত্ত্বেও মধ্যবিত্তরা সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। আমরা আশা করব এমন ব্যবস্থা যেখানে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার জন্য মানুষকে বিনিদ্র রজনী যাপন করতে হবে না।

লেখক পরিচিতি: ডা. দেবীপ্রসন্ন ঘোষাল জেনারেল সার্জারিতে এম এস করার পর গত বারো বছর সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসারত। বর্তমানে তিনি কলকাতার একটি সরকারি মেডিক্যাল কলেজের সহযোগী অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত।

এক গাঁয়ের ডাক্তারের গল্প

এদেশের গ্রামে চিকিৎসা পরিষেবার হাল খুব খারাপ। সরকারি যেসব স্বাস্থ্যকেন্দ্র-গ্রামীণ হাসপাতাল আছে সেখানে ওষুধ যন্ত্রপাতি কিছুই নেই— আছে শুধু জঞ্জালের স্তূপ। শহরের মাঝখানে মেডিক্যাল কলেজে বসে পাঁচ-দশ বছর পড়াশুনা করে যখন নতুন ডাক্তারেরা গ্রামের সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যান তখন অনেকেই পালাবার পথ পান না। তবে সকলেই তো পালাবার লোক নন, তাঁরা শেষ অবধি না দেখে ছাড়েন না— সেই দেখার আর বাঁচার সত্যি কাহিনী বলেছেন **ডা. অনিরুদ্ধ সেনগুপ্ত**।

মদ্যপ বাপের হাত থেকে মাকে বাঁচাতে গিয়ে লাঠিটা পড়ল ১৬ বছরের ছেলেটার ডান হাতের ওপর। হাতের তেলোর যে চারটে লম্বা হাড় আছে কবজি থেকে আঙুলের গোড়া পর্যন্ত, ডাক্তারি ভাষায় তাদের বলে মেটাকারপাল হাড়, তাদের সবকটা আড়াআড়ি ভাঙলো। পাড়ার কয়েকজন আর স্বপনের মা ছেলেকে নিয়ে আমার কাছে অর্থাৎ বেলপুকুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে হাজির। আমার হাসপাতালে এক্স-রে নেই, কিন্তু হাতটা খালি চোখে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে বাইরে থেকে প্লাস্টার করলে জুড়বে না— অপারেশন না করলে হাড়ের ভাঙা টুকরোগুলো সরে যাবে। সাময়িক ব্যথা কমানোর জন্য ওষুধ আর কাঠের খাঁচার মধ্যে হাতটা বেঁধে, পরের দিন সকালে ডায়মন্ডহারবার মহকুমা হাসপাতালে পাঠালাম— ওখানে এক্স-রের ব্যবস্থা আছে আর সেইসঙ্গে আছে অর্থোপেডিক সার্জেনকে দেখাবার সুবিধা।

মহকুমা হাসপাতালে এক্স-রে করা গেল না— প্লেট নেই। অগত্যা হাসপাতালের উল্টোদিকে একটা বেসরকারি ক্লিনিক থেকে এক্স-রে করে অর্থোপেডিক সার্জেন আর আমার সন্দেহ প্রমাণ হল— চারটা হাড়ই এমনভাবে সরে গিয়েছে যে অপারেশন না করলে জুড়বার কোনোই সম্ভাবনা নেই। মহকুমা হাসপাতাল হলেও এই অপারেশন করার মতো যন্ত্রপাতি নেই, এমনকি অপারেশন করার পরে এক্স-রে করার প্লেটও নেই— তাই কলকাতার বড় হাসপাতালে 'রেফার' লিখে দেওয়া হল। আউটডোর থেকে হতোদ্যম হয়ে বেরোবার মুখে একজন সহৃদয় দালাল অবশ্য বলেছিলেন যে কাছেই একটা নার্সিংহোমে এই ডাক্তারবাবুকে দিয়ে অপারেশনটা করিয়ে নেওয়া যেতে পারে— কলকাতায় ভর্তির জন্য বড্ড বেশি সময় লাগে। এক্স-রে করতেই স্বপনদের যেটুকু পয়সাকড়ি ছিল তা প্রায় শেষ— কলকাতায় যাবে কি, এমনকি ভাত খাবারই পয়সা নেই। তাই স্বপনেরা পরের দিন সকালে আবার বেলপুকুর হাসপাতালে হাজির।

স্বপনের মার কান্নাকাটির ফলে স্রেফ অনুরোধে ঢেঁকি গিলতে রাজি হলাম। বইপত্র ঘেঁটেও কোনো দিশা পেলাম না। যন্ত্রপাতি যা লাগবে তা মহকুমা হাসপাতালে নেই— বেলপুকুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র তো কোন ছার। অনেক ভাবনা-চিন্তার পর স্বপনের মাকে ৪ টে স্টিলের গুনছুঁচ কিনতে বললাম— দাম ৮ টাকা। স্টিলের জিনিস লোহার মতো ভঙ্গুর নয়, আর শরীরের ভেতরে অনেকদিন থাকলেও ক্ষতি হয় না। স্থানীয় ইলেকট্রিসিয়ান মানিক আমার ফুটবল খেলার সঙ্গী, তাকে বলে আনালাম মোটা তামার তার আর ওর সূক্ষ্ম ইনসুলেটেড একটা প্লায়ার্স। সবগুলোকে অটোক্লেভ করা হল। এইসব আয়োজন করতে সন্ধ্যা হয়ে গেল।

বিদ্যুৎ আছে কিন্তু ভোল্টেজ এতই কম যে ২০০ ওয়াটের বাল্বেরও ফিলামেন্টটা দেখা যাচ্ছে— বেলপুকুরে যাবার আগে এই অভিজ্ঞতা আমার হয়নি। অপারেশন শুরু হল। অপারেশন থিয়েটার নেই তাই লেবার রুমটাতেই অপারেশন হচ্ছে। দু'টো টুলের উপর দাঁড়িয়ে দু'জন স্থানীয় বাসিন্দা ৫-ব্যাটারির টর্চ ধরে অপারেশনের জায়গায় আলো ফেলছেন। হাতের পিছনের দিকটা কেটে হাড়গুলোর ভাঙা অংশগুলো পরিষ্কার দেখতে পেলাম। ঠেলে সব কটাই ঠিকভাবে বসিয়ে দিলাম কিন্তু যা ভেবেছিলাম তাই— হাড়গুলো কেবলই সরে যাচ্ছে। এইবার গুনছুঁচগুলো একটা একটা করে ভাঙা হাড়গুলোর পাশে বসিয়ে তামার তার দিয়ে বেঁধে দিলাম— দেখে নিশ্চিন্ত হলাম যে আর হাড়ের টুকরোগুলো সরে যাচ্ছে না। তামার তারের সুবিধা যে নরম আর অনায়াসে পেঁচানো যায়। এই সময়ে মানিকের সূক্ষ্ম প্লায়ার্সটা না থাকলে খুবই অসুবিধায় পড়তাম। ক্ষতটা সেলাই করে দিলাম কিন্তু গুনছুঁচগুলোর ১ ইঞ্চি মতো বাইরে রেখে দিলাম— পরে বাইরে থেকেই বের করে নেওয়া যাবে। ৪ সপ্তাহ বাদে আবার এক্স-রে করতে বললাম। সব কটা হাড়ই স্বাভাবিক জুড়ে গিয়েছে। শুনলাম দ্বিতীয়বার এক্স-রে করার সময়ে রেডিয়োলজিস্ট গুনছুঁচগুলো দেখে চমকে গিয়েছিলেন। ৬ সপ্তাহ বাদে ছুঁচগুলো টেনে খুলে দিলাম।

স্বপন এখন স্কুলের মাস্টারমশাই। ব্ল্যাকবোর্ডে ডান হাতেই লেখে— বাঁ হাতে লেখাটা মাত্র ৬ সপ্তাহে ঠিকভাবে রপ্ত করা যায়নি!

* * *

কিন্তু সেদিন অপারেশন শেষ করে আমার মনে হয়েছিল, আরে, আমি যদি এখন মেডিক্যাল

কলেজে ক্যান্টিনে গিয়ে আমার 'আবিষ্কৃত' গুন-ছুঁচ সার্জারির কথা বলি তো সেখানকার ডাক্তারেরা আমাকে দল বেঁধে দেখতে আসবে। না, আমার আবিষ্কারে মোহিত হয়ে নয়, লোকে যেমন চিড়িয়াখানায় দলবেঁধে জিরাফ কি বনবিড়াল দেখতে যায় সেরকম করে। আমিও তো ওই হাসপাতালে প্রায় বছরদুয়েক সার্জারির বিভিন্ন বিভাগ-উপবিভাগে হাউসস্টাফশিপ করেছি, সে সময়ে এমন অদ্ভুত গুনছুঁচ সার্জারির কথা শুনলে নির্ঘাত খ্যা খ্যা করে হাসতাম আর বলতাম, আরে মূর্খ গাঁইয়া ভূত, অর্থোপেডিকে তো কতরকম স্প্লিন্ট প্লেট নেল হ্যানা ত্যানা আছে, তার একটাও যোগাড় করতে পারলি না! আর তারপরে যদি জানতাম ওটা ইলেকট্রিক মিস্ত্রির প্লায়ার্স দিয়ে ইলেকট্রিকের তামার তার বাঁধা হয়েছে তো ভাবতাম, জিরাফ-টিরাফ না, এ ডাক্তার একেবারে হলদে সবুজ ওরাং ওটাং!

তা জিরাফই হই বা ওরাং ওটাং, স্বপনের হাতটা কিন্তু দিব্যি জোড়া লেগেছিল। আর স্বপনই হল বেলপুকুরে করা আমার প্রথম সার্জারি কেস! এই সার্জারি করার বছর-চারেক পরে এক আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে গিয়ে আমি ডা. মরিস কিং-এর সম্পর্কে লেকচার শুনি। ডা. কিং-এর কাজ ছিল 'রুরাল সার্জারি' নিয়ে, অর্থাৎ গ্রামে গ্রামে যেখানে সেরকম সুযোগ-সুবিধা নেই, সেখানে কিভাবে সার্জারি করা সম্ভব। ডা. কিং কিনিয়াতে 'রুরাল সার্জারি'র ধারণাটি ছড়িয়ে দিয়েছেন, সেখানকার প্রত্যন্ত গ্রামে বহু অপারেশন ডকুমেন্ট করেছেন। এবং তাঁর মূল কথাটাই হল, যেটা নেই জরুরি পরিস্থিতিতে সেটা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে যেটা আছে সেটা কাজে লাগাও, আর কাজে লাগাও বিজ্ঞান-সম্মতভাবে। তখন বুঝলাম আমার গুন-ছুঁচ সার্জারি ওই পরিস্থিতিতে শুধু একমাত্র উপায় নয়, ওইটাই ওখানে ফলিত বিজ্ঞান। মেডিক্যাল কলেজে একথাটা আমাদের কেউ শেখায়নি, কিন্তু সেটা বোধকরি আমাদের চলতি-হাওয়ার-পন্থি হওয়ার বদভ্যাসের ফল।

শুরুর গপ্পো

এ অবশ্য আমার বেলপুকুর যাবার ঢের পরের ঘটনা। দেড়শ বছরের পুরানো মেডিক্যাল কলেজে পাঁচ বছর ধরে পড়াশুনা করে নামের পাশে এম বি বি এস পাকাপাকি লাগানোর জন্য আরও একবছর সব ডিপার্টমেন্টে ঘুরে ইন্টার্নশিপ করার পরে হাউসস্টাফশিপ। সার্জারিতে, তারপর কার্ডিও-থোরাসিক সার্জারিতে— এরকম করে বছরদুয়েক হাউসস্টাফশিপের পরে যখন মনে হল, নাঃ, এইবার একটু চাকরি বাকরি করে দেখলে মন্দ হয় না, তখন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ইউ পি এস সি পরীক্ষায় উতরে গিয়ে দিল্লিতে বড় হাসপাতালের ডাক্তারের চেয়ারে বসলাম। সবাই বলল, বাঃ, খাসা কেরিয়ার, দিব্যি গুছিয়ে নিয়েছে, ঠিক তখনই আমার মাথার পোকাটা কিলবিল করে উঠল— চল পানসি বেলঘরিয়া। অবশ্য ঠিক বেলঘরিয়া নয়, বেলপুকুর, কলকাতা থেকে ৭৬ কিলোমিটার দূরে পান্ডববর্জিত পাড়াগাঁ। রাজ্য-সরকারের পি এস সি পরীক্ষা দিয়ে সেখানে পোস্টেড। সাল ১৯৯০।

রবিঠাকুরের 'পোস্টমাস্টার' পড়েছেন তো? কলকাতার ছেলেকে গ্রামে গিয়ে থাকতে হলে সে ঠিক যেন জল থেকে তোলা জ্যান্ত পোনামাছ, মেছুনির হাঁড়িতে খাবি খাচ্ছে। ডন বস্কো ইস্কুলে পড়েছিলুম, দিব্যি ইংরেজি কেতার ইস্কুল, আর তারপর কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ; গ্রামে যাবার বাই যে কি করে মাথায় চাপল সেটা ভাবলে এখনো আশ্চর্য হয়ে যাই। কিন্তু ললাটঙ্ক লিখনং, রাজ্য-সরকারের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র বেলপুকুরে, সেখানেই যখন প্রথম পোস্টিংটা হল তখন ভাবলাম, আরে গিয়ে দেখা যাক না। গ্রাম, প্রকৃতি, নদী-টদী ভালোই লেগে যাবে হয়তো। সুতরাং বেলপুকুরে গিয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চার্জ হাতে নিলাম। ডাক্তারের কোয়ার্টার নেই, ইলেকট্রিসিটি নেই, জলের কল নেই, ওষুধ নেই, স্টাফ নেই—এক্কেরে সেই কবিতার 'নেই রাজ্যের বাসিন্দা'। দু-তিন দিন কলকাতা থেকে ডেলি পাষন্ডগিরি করে বুঝলাম, এর চাইতে নেই রাজ্যের পাকাপাকি বাসিন্দা হওয়া ভালো, নইলে দিবস-রজনী আমার রেলের বাঁশির আশায় আশায় থাকা পোষাবে না। সুতরাং কলকাতা ঠিকানা ঘুচল, নতুন সাকিন গ্রাম বেলপুকুর, মহকুমা ডায়মন্ডহারবার, জিলা দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা।

ডাক্তারের কোয়ার্টার নেই বলেছিলাম না? ভুল বলেছিলাম, সুকুমার রায়ের কবিতার বুড়ির বাড়ির মতো একটা ভাঙা বাড়ি দেখিয়ে সবাই বলত ডাক্তার কোয়ার্টার। আর বলত মানুষ থাকে না বটে, সাপেরা দিব্যি আরামে থাকে, কেউটে সাপ। কলে জল নেই তবে টিউবওয়েল আছে, তাতে জলও ওঠে সাধারণত। ইলেকট্রিসিটি নেই বলেছিলাম? ইলেকট্রিক আলো জ্বলে না বটে, কিন্তু স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পাশেই ইলেকট্রিক ট্রান্সফর্মার আছে, একদা ইলেকট্রিসিটি ছিল। কিন্তু আমার আগের ডাক্তারবাবু হাসপাতালেই যাকে বলে 'হাইলি সাসপিশাস' অবস্থায় মারা গেলে ডাকাতের ভয়ে ওখানে অনেকদিন কোনো ডাক্তারবাবু পোস্টিং নিয়ে আসেন নি, সুতরাং বিদ্যুৎবাবুও ফুড়ুৎ। খাসা রোমান্টিক জায়গা।

সাতদিন না যেতেই বুঝে গেলাম ডাক্তার কোয়ার্টার নামক ভাঙা সাপের বাড়িটাতে থাকা সম্ভব নয়। একটা ছোটো কোয়ার্টার একটু আস্ত ছিল, আর খালিও ছিল, শুনলাম ওটা নাকি আমার চাইতে পদমর্যাদায় অনেক ছোটো অধস্তন কর্মচারির থাকার জন্য তৈরি। পদমর্যাদা কথাটা দিল্লি বা কলকাতায় বসে শুনতে বেশ ভালো লাগে, কিন্তু এখানে ঐ বাড়িটাই একটু রঙ করে মেরামত করে থাকাটাই বুদ্ধিমানের কাজ, সুতরাং নিজেই ব্যবস্থা করে ওখানে মাথা গোঁজার ঠাঁই করে ফেললাম।

কাজের গপ্পো

আউটডোরে বসে রোগী দেখতে গিয়ে কিছু সমস্যায় পড়লাম। মেডিক্যাল কলেজে তো সার্জারি ডিপার্টমেন্টে কাজ করেছি, সার্জারির সমস্যা ছাড়া অন্য সমস্যা নিয়ে রোগী এলে তার সমস্যা তাড়াতাড়ি শুনেই ভাগিয়ে দিয়েছি মেডিসিন কি গাইনি ওরকম কোনো জুতসই ডিপার্টমেন্টে। দিল্লিতে জেনারেল আউটডোরে বসে রোগী দেখেছি বটে, কিন্তু সেখানে ভারি পালিশ করা ব্যাপার-স্যাপার, শহুরে রোগীরা বেশ গম্ভীরসে আমাদের বলতো প্রেসারটা চেক করে দিতে, আর স্পেশালিস্ট ডাক্তারের লেখা ওষুধগুলো সরকারি প্রেসক্রিপশনে তুলে দিতে যাতে তারা সরকারি দাবাখানা থেকে তোফা ওষুধ পেতে পারে; খামোখা জেনারেল ডাক্তারদের কাছে রোগের চিকিৎসা করাতে আসার মতো দুর্বুদ্ধি তাদের কস্মিনকালেও হতো না।

কিন্তু এখানে তো বেশিরভাগ মানুষের পেট খারাপ, জ্বর, কাশি, চুলকানি—এটা আমার ধারণাতেই ছিল না। এদের চিকিৎসা করি কিভাবে? হাসপাতালে ওষুধ বলতে আছে ছ-সাত রকমের ট্যাবলেট, তাও অতি অল্প পরিমাণে। তারমধ্যে কয়েকটা ওষুধ এর আগে কখনও ব্যবহার করিনি, মানে করবার দরকার হয়নি, উন্নততর ওষুধ হাতের কাছে থাকার ফলে—যেমন সালফাডাইজিন। আর ছিল অকেজো ওষুধ— সোডি-বাইকার্বোনেট পাউডার, তিরিশ বছর আগে কি সব ওষুধে ওটা

কাজে লাগত, তো সরকার মায়া করে ওটাকে ত্যাগ করতে পারেনি। ডায়রিয়ার চিকিৎসার ও আর এস তৈরি করতে সোডি-বাইকার্বোনেট একটু লাগে বটে, কিন্তু ও আর এস তৈরির অন্য উপাদান গুলো ছিল না, অতএব ওটা নেহাত অকেজো লোক-ভোলানো পাউডার-ওষুধ হিসেবে পড়ে থাকত।

তবে একটা সমস্যা অনেক ডাক্তারের হয়, আমার হয়নি, ভাগ্যক্রমে বা আমার মেজাজের গুণে। এসে কাজ করতে শুরু করার প্রথম দিনেই মহা গন্ডোগোল লেগে গেল। আমাদের হাসপাতালের ড্রেনটা যেখান দিয়ে বেরোচ্ছে সেখানে এক স্থানীয় বাসিন্দা বাগান করে বসে আছে, ফলে ড্রেনের জল বেরোচ্ছে না, জমা হচ্ছে হাসপাতালের সামনে আর ভিতরে। ড্রেনটা পরিষ্কার করতে আমি লোক পাঠিয়েছিলাম, খানিক বাদে আমার কাছে খবর এল, সেই বাগান করনেওয়ালা মদ খেয়ে তাকে মারতে এসেছে। গেলাম সেদিকে, খানিক তর্কাতর্কি হল, তারপর বাগানবাবুর গালে সপাটে এক থাপ্পড় লাগিয়ে দিলাম। ভারি খারাপ কাজ বোধহয়, কিন্তু তার নেশা গেল ছুটে এবং ড্রেন পরিষ্কার করতে তারপর কারো কোনো অসুবিধা হয়নি। আর গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে, চার বছর পরে এক ছোকরা ডাক্তার এসেছে ঠিকই, কিন্তু শা... মহা বদমেজাজি। ফলে আমাকে ঘাঁটানোর দুর্বুদ্ধি বিশেষ কারো হয়নি।

প্রথম এক সপ্তাহ তো গেল স্রেফ ধাতস্থ হতে, ব্যবস্থা করতে, আর হাসপাতালে কে কি ডিউটি করে সেটা বুঝে নিতে। দুর্গাদি ছিলেন নার্স, বয়স হয়েছে, তার ওপর দু-চোখেই ছানি, কিচ্ছু দেখতে পান না, সকালে এসে হাজিরা-খাতায় সই করে চলে যান, আর সই করার সময়ে তাঁর হাতের পেনটা হাতে ধরে তাঁর নামের পাশে বসিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে বলতে হয়—উঁহু, অত ওপরে নয়, একটু নামিয়ে, হ্যাঁ হ্যাঁ, আরে আবার বড্ড নেমে যাচ্ছে যে— ইত্যাদি, ইত্যাদি। আর আছে আশিস, মাধ্যমিক পাশ, সেই ফার্মাসিস্টের কাজ করে দেয়। এবং সোলেমান, একাধারে রোগীর ড্রেসিং, ব্যান্ডেজ করা, টিকিট করা, আর হাঁকডাক করে রোগীদের সামলানো তার কাজ।

এভাবে শিখতে শিখতে, খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলতে চলতে কিছুদিন বাদে মনে হল, নাঃ, ইলেকট্রিক ট্রান্সফর্মার থাকবে চোখের সামনে আর আলো জ্বলবে হ্যারিকেনের, এ চলবে না। গেলাম আট কিলোমিটার দূরে কুলপির স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড অফিসে। তারা সব ভারি নিয়মনিষ্ঠ মানুষ, আমাকে কয়েক বছরের বকেয়া বিল, লাইন টেস্টিং ফর্ম (এবং সেটা করে দেখাবার জন্য পেটোয়া ইলেকট্রিসিয়ানের নাম!)— এইসব গল্প শোনালেন। বুঝলাম এঁদের দিয়ে কাজ করাতে ছ'মাস লাগবে আর সাতমণ তেলও পোড়াতে হবে হাসিমুখে। পোষাবে না। সুতরাং হাসপাতালে ফিরে এসে স্থানীয় একটি ছেলেকে ডেকে তিরিশ মিটার তার কিনলাম। হাসপাতাল চত্বরেই যে ট্রান্সফর্মারটা ছিল, সেটা থেকে লাইন টেনে জুড়ে দিল হাসপাতালের অকেজো পড়ে থাকা মিটারবক্সে। ব্যস! চারবছর পরে হাসপাতালে আবার আলো জ্বলল। স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের কর্তাদের নজরে আসতে আরও একবছর সময় লাগল। লাইন কেটে দেবার হুমকি, আমার পাল্টা হুমকি, এসব চলার পর নিয়মভাঙা কাজগুলো সব কেমন নিয়মমাফিক বলে বুঝতে পারলেন তাঁরা, এবং সুবোধ বালকের মতো ইলেকট্রিক বিল পাঠাতে শুরু করলেন।

একখামচা রোজনামচা

যাকগে, সেতো একবছর পরের কথা, একটু বর্তমানে ফেরা যাক। আসার ঠিক পরে পরে হাসপাতালের টিউবওয়েল সারানো, পাখা ঠিক করা, ওষুধের খাতা ধরে ওষুধ মেলানো (একে বলে স্টক রেজিস্টার মেলানো), ইত্যাদি কাজগুলো টুকটুক করে করতে লাগলাম। আউটডোরে রোগীর সংখ্যা বাড়তে লাগল—ধীরে, খুবই ধীরে। ডাক্তার-বিহীন এলাকার মানুষের প্রধান ভরসা স্থানীয় হাতুড়ে ডাক্তারদের কাছেই লোকে আপদে-বিপদে যেতে থাকল। কেউ বুঝতে পারছিল না শহরে বড় হয়ে ওঠা ডাক্তার এখানে কদ্দিন টিকবে। ওদের দোষ নেই, আমিই কি ছাই বুঝতে পারছিলাম আর কদ্দিন?

সন্ধেবেলায় কিচ্ছু করার উপায় নেই। ধানকল আর কাঠচেরাই কলগুলো গোঁ গোঁ করে চলে আর ভোল্টেজ যায় কমে, সব থেকে জোরালো বাল্বটাও টিমটিম করে জ্বলে আর তার ভেতরের ফিলামেন্টটা দিব্যি দেখা যায়। সুতরাং আলোর সত্যিই দরকার হলে লণ্ঠন জ্বালাতে হয়। তারমধ্যে হঠাৎ এক আশার আলো। কুলপির ব্লক মেডিকেল অফিসার অজয়দা খুব উৎসাহী লোক। মাঝে মধ্যে একসাথে আড্ডা জমে। একদিন অজয়দা কথায় কথায় প্রস্তাব দিলেন—তুমি কুলপিতে সপ্তাহে একদিন করে ছোটোখাটো অপারেশন কর। আমার তো হাতে প্রায় স্বর্গ; মেঘ না চাইতেই শুধু জল নয়, একেবারে মহাপ্লাবন। আমার আউটডোরে এর মধ্যেই বেশকিছু হার্নিয়া, হাইড্রোসিল, অ্যাপেন্ডিসাইটিস এইসব পেয়েছিলাম যাদের সহজেই অপারেশন করে দিতে পারতাম, কিন্তু আমার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যন্ত্রপাতি কিছুই নেই— এমনকি কেটে গেলে সেলাই করার নিডল-হোল্ডার, যেটা দিয়ে ছুঁচ ধরে সেলাই করতে হয়, সেটাও নেই। কিন্তু কুলপির এই গপ্পো পরে বলব, আগে ফিরে আসি বেলপুকুরে।

কাজ শুরু করার তিন মাস বাদে মহাধাক্কাটা খেলাম। আমার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রয়োজনীয় আগামী তিনমাসের ওষুধ-বিষুধের আন্দাজ করে সেই মতো একটা তালিকা পেশ করতে হয় জেলার প্রধান মেডিকেল অফিসারের অফিসে। একে বলে কোয়ার্টালি ইনডেন্ট করা। অফিসের বাবুরা সেই তালিকা দেখে ওষুধ সরবরাহ করেন। আমি সরকারি ক্যাটালগ ঘেঁটে ১২ পাতার হাতে লেখা ইনডেন্ট তৈরি করে নিয়ে গেলাম। ঠিক করেছিলাম স্টোরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মেডিক্যাল অফিসারের সঙ্গে কথা বলে সব যন্ত্রপাতি নিয়ে আসব। গিয়ে শুনলাম তিনি নাকি মাসে একদিনই অফিসে আসেন, মাইনের দিন। মাইনে নেন, আর একমাসের সব সই করে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি চলে যান একমাস বিশ্রাম করতে। কয়েকজন কেরানি স্টোরটা চালান। তাঁরা আমার ইনডেন্ট দেখে বললেন—এত কাগজ নষ্ট করেছেন কেন? তারপর ১১ পাতা ভর্তি NS(No Supply) অর্থাৎ 'ওষুধ মিলবে না' লেখা ইনডেন্ট কাগজগুলো নিয়ে ফিরে এলাম বেলপুকুর। আর নিয়ে এলাম এই কেরানিদের ওপর প্রচন্ড রাগ।

গপ্পোটা এখানেই শেষ হতে পারত, অন্তত শেষ হওয়াটাই উচিৎ ছিল। কেউ কিচ্ছু করে না, তাই দেশের এই দশা, কে না জানে সেটা। আমাদের গপ্পো তো সেই জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে, সুতরাং গল্পের নটে গাছটি মুড়োলো।

মুড়োতে মুড়োতেও নটেগাছ যে শেষ অবধি মুড়োলো না তার দায়িত্ব আমার নয়, রশিদার, রশিদাদের মতো আর-পাঁচজনের। যদিও ভালো গল্পের নিয়ম মেনে রশিদার ঘটনাটা আমি যেদিন পাতা ভর্তি 'ওষুধ মিলবে না' লেখা কাগজগুলো নিয়ে ফিরে এলাম তার পরদিনই ঘটা উচিত ছিল,

কিন্তু এ গপ্পো যিনি লিখেছেন তিনি বোধকরি মুম্বাই-মাপের স্ক্রিপ্ট লেখক নন, তাই ঘটনাটা ঘটেছিল অন্য কোনো সময়ে, অন্য কোনো দিনে। তবে সেরকম ঘটনা ঘটে বলেই আজ আমি এই গপ্পোটা লিখতে পারছি।

যে নটেগাছ মুড়োয় না

সকাল আটটা— বেলপুকুর হাসপাতালের ঠিক সামনে রশিদা বিবি বসে আছে। তার বাড়ি বেশ দূর, পাঁচ নম্বর হাট থেকে আরো ছ-কিলোমিটার হাঁটা রাস্তা। আজ সোমবার, আউটডোরে খুব ভিড়। রাস্তা থেকে আমার আর সোলেমানের হাঁকডাক শোনা যাচ্ছে। সোলেমান চা আনতে বাইরে এসে রশিদাকে জিজ্ঞেস করল— 'দাদা জানে তুমি এসেছো? টিকিট জমা দিয়েছো তুমি?' রশিদা বলল—'না বাবার সাথে আমার অন্য কথা আছে।' রশিদা আমাকে 'বাবা' ডাকত। সোলেমান তাকে আর কিছু বলল না, কেননা সবাই জানে আমার কাছে অবাধ প্রবেশ যে গুটিকয় রোগীর রশিদা তাদের মধ্যে একজন।

বিকেল সাড়ে চারটের সময় আউটডোর শেষ করে আমি তাড়াহুড়ো করে বেরোচ্ছি, দেখি রশিদা তখনও বসে। সে কিছু বলার আগেই আমি বললাম— 'কী হয়েছে? টিকিট জমা দাওনি? ওখানে বসো, আমি খেয়ে এসে দেখে দেব।' রশিদা আবার বসে পড়ল।

সন্ধে সাড়ে ছ'টার সময় ফিরে আমি দেখি রশিদা তখনও বসে। কাছে আসতেই বলল, 'বাবা, তোমার কাছে একটা দরকার আছে।' তারপর কোয়ার্টারের বারান্দার কাছে এসে একটা থলে থেকে এক ডজন ডিম বার করে বলল—'তোমার জন্য।' রশিদা সংসার চালায় ডিম বেচে, কিন্তু আজ সে হাটে যায়নি, সব ক'টা ডিম নিয়ে এসেছে তার 'বাবা'র জন্য। ও ভালোবাসা প্রকাশের এই একটা ভাষাই জানে।

এঁদের জন্য পৃথিবীতে এখনো বাঁচবার মানে আছে। এই রকম কতো যে ঘটনা—আমাকে একতাড়া ইনডেন্ট কাগজ ভর্তি 'ওষুধ মিলবে না' লেখা নিয়ে ফিরে আসার হীনতা অসহায়তাকে ভুলিয়ে দেয়। আজও। এঁদের কথা আবার বলব পরের সংখ্যায়।

লেখক পরিচিতি: ডা. অনিরুদ্ধ সেনগুপ্ত এম বি বি এস। বর্তমানে ওয়ার্ল্ড হেলথ অরগানাইজেশনে (WHO) জনস্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করছেন।

advt.

অনীক

'অনীক' পত্রিকা ৪৮ বছরে পা দিয়েছে। এই দীর্ঘ সময় ধরে অনীক চেষ্টা করেছে সমসাময়িক গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ হতে। 'অনীক'-এর বয়োপ্রাপ্তির ইতিহাস তাই সমকালীন গণ-আন্দোলনের চলমান দর্পণও বটে। কোনো বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর মুখপত্র না হয়েও, সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকারে অবিচল থেকে সমকালীন রাজনীতি-অর্থনীতি ও সামাজিক প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে— রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ ছাড়াও গল্প-কবিতা-নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে।
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১৫০ টাকা (সডাক)
অনীক, প্রযত্নে : পিপলস বুক সোসাইটি। ১০/২ বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা - ৭০০০০৯
ফোন—৯৪৩২৮৭৭৫৬০/৯৮৩০১৪৩৩৬৫/৯৪৩৩৭২৪৪৬২

advt.

পাভলভ ইনস্টিটিউটের দু'টি পত্রিকা

মানবমন
মনোবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞানের আধুনিক ধারা পরিচায়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১০০ টাকা

Psyche and Society
Six-monthly Journal
Yearly Subscription Rs. 50

পাভলভ ইনস্টিটিউট
৯৮, মহাত্মা গান্ধি রোড
কলি - ৭০০০০৭
ফোন- ২২৪১ ২৯৩৫
৯৪৭৭২৪২৯৩৯
৯৪৩৩৬৬২৭৭৬

পাভলভ ইনস্টিটিউটের ক'টি বই

ডা. ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়-এর
পাভলভ পরিচিতি (দেড়শো টাকা)
শৈশব ও তার সমস্যা (পঞ্চাশ টাকা)
বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ (দুশো টাকা)

ডা. বাসুদেব মুখোপাধ্যায়-এর
গ্রামীণ স্বাস্থ্য (চল্লিশ টাকা)
রোগ অসুখ (আশি টাকা)

বিশ্বভরা প্রাণ

ডা. আশীষ কুমার কুন্ডু

আমি যে ধরনের ডাক্তারির সাথে যুক্ত তাতে আমাকে হামেশাই এমন রোগীদের দেখতে হয় যাদের রোগের কার্যত কোনো চিকিৎসাই নেই। এদের মধ্যে একটা হল 'ডুসেন মাসকুলার ডিসট্রফি' (Duchenne Muscular Dystrophy)—সংক্ষেপে 'ডি এম ডি।'

ডুসেন সাহেবের নামে এই রোগটা ছেলেদেরই হয়। মেয়েরা এই রোগের বাহক (carrier)। অর্থাৎ মায়ের শরীরের একটা ত্রুটিপূর্ণ জিন ছেলের শরীরে এই রোগের জন্ম দেয়।

ডিসট্রফি মানে হল মাংসপেশিগুলো অকেজো বা দুর্বল হয়ে যাওয়া। সন্তান জন্মায় সুস্থ। কিন্তু পাঁচ বছরের আগেই দুর্বলতাগুলো চোখে পড়তে থাকে। প্রথমে চলাফেরা, স্বাভাবিক কাজ ব্যাহত হয়। যেহেতু সমস্ত মাংসপেশিই দুর্বল হয় তাই ক্রমশ হৃদযন্ত্র এবং ফুসফুসের মাংসপেশিও অক্ষম হতে থাকে। মানুষের শরীরের ক্রোমোজমের চরিত্র হল—মেয়েদের শরীরে 46XX আর ছেলেদের 46XY। XX আর XY দুটিকে বলা হয় সেক্স ক্রোমোজম। ডি এম ডি রোগটির উৎস মায়ের শরীরের X ক্রোমোজম। ছেলের শরীরের এই ত্রুটিপূর্ণ X ক্রোমোজম ডিসট্রফিন নামে একটা প্রোটিনের উৎপাদন ব্যাহত করে। ডিসট্রফিনের অভাবই মাংসপেশিগুলোকে দুর্বল করতে থাকে।

সারা পৃথিবী জুড়েই ডি এম ডি-র চিকিৎসা নিয়ে বিভিন্ন ধরণের গবেষণা চলছে। এর মধ্যে প্রধান হচ্ছে রোগীর শরীরে ডিসট্রফিনকে কিছুটা পাল্টে দেওয়া। এছাড়া আছে স্টেম সেল থেরাপি, জিন থেরাপি ইত্যাদি। উপায় নিশ্চয় বেরোবে। কিন্তু এখন হচ্ছে সময়ের সাথে প্রতিযোগিতা। আর কত দেরি?

*** *** ***

আমার ডাক্তারি জীবনে এমন অনেক ছোট্ট বন্ধু ছিল এবং আছে যারা ডি এম ডি-তে আক্রান্ত। তাদের সাথে পরিচয় হয় যখন তাদের বাবা-মা চিকিৎসার আশায় আমার কাছে আসেন। যেহেতু চিকিৎসা প্রায় কিছুই নেই—তাই ডাক্তার-রোগীর সম্পর্ক আর থাকে না। তাদের সাথে গল্প হয়। প্রসঙ্গত অনেক সময় দেখি রোগী এবং তাদের বাবা-মা এই রোগ সম্পর্কে আমার চেয়ে বেশি খোঁজ খবর রাখেন। আমার কাজ হয় গল্প করা আর রোগীর কাছে রোগ সম্পর্কে জানা।

অভিরূপ আমার এইরকমই একজন বন্ধু। আমি ওকে বলেছিলাম '**স্বাস্থ্যের বৃত্তে**'র জন্য তার নিজের রোগ সম্পর্কে একটা লেখা দিতে। অভিরূপের বাবা-মা দুজনেই ডাক্তার। শান্ত, বুদ্ধিদীপ্ত, অন্তর্মুখী অভিরূপ তার রোগ নিয়ে যত জানে—আমরা অধিকাংশ ডাক্তাররাই তা জানি না। এর পরের লেখাটি অভিরূপেরই। আমিই নাম দিয়েছি 'স্কুবি ডুবি ডু।'

স্কুবি ডুবি ডু

অভিরূপ চ্যাটার্জী

আমি অভিরূপ চ্যাটার্জী। ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯-এ আমার জন্ম হয় দেরাদুনের হিমালয়ান মেডিকেল ইনস্টিটিউশনে। আমার ছ'মাস বয়সে আমরা চলে যাই বিলাসপুরে (ছত্তিশগড়)। সেখানেই আমি দশ বছর বাবা, মা আর দিদির সাথে কাটাই। ছোটো বয়সে আমি গোল্ডেন নার্শারি স্কুলে পড়তাম। তারপর ভর্তি হই জৈন ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে। এটা একটা বোর্ডিং স্কুল। এখানেই আমি চতুর্থ গ্রেড পর্যন্ত পড়ি।

২০১০-এ আমরা চলে আসি কলকাতায়। বাবা, মা, দিদি, দাদু, দিদিমা আর আমার আদরের সঙ্গী 'স্কুবি'— কুচকুচে কালো এক ল্যাব্রাডর। আমার একটা জেনেটিক সমস্যা আছে যার নাম 'ডুসেন মাসকুলার ডিসট্রফি'।

তোমাদের হয়তো মনে হয় যে যারা হুইলচেয়ারে ঘুরে বেড়ায় তারা জড়বুদ্ধি অথবা পড়াশুনা করতে পারে না— তা কিন্তু একেবারেই ঠিক নয়। এ ব্যাপারে আমরা তোমাদেরই মতো। এবারে আমি তোমাদের ডি এম ডি নিয়ে কিছু বলি— এই রোগ কেন হয়, এর চিকিৎসা কি, এই রোগে আক্রান্ত ছেলেরা কিভাবে তাদের সমস্যগুলো সামলায় আর আমিই বা কি করি।

১৯৮০ সাল পর্যন্ত ডি এম ডি বা অন্যান্য মাসকুলার ডিসট্রফি সম্পর্কে খুব কমই জানা ছিল। ১৯৮৬ সালে কিছু বিজ্ঞানী সেই জিনটা আবিষ্কার করলেন যেটা স্বাভাবিক না হলে এই রোগটি হয়।

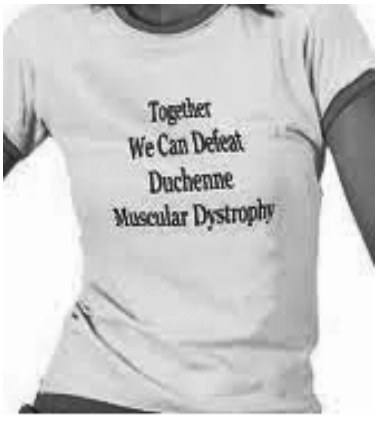

১৯৮৭ সালে জানা গেল ডিসট্রফিন নামে সেই প্রোটিনটার কথা যা এই জিনটি থেকে তৈরি হয় আর এই ডিসট্রফিন প্রোটিনের অভাবেই মাংসপেশিগুলো অকেজো হয়ে পড়ে। জিনের একটা প্রধান কাজ বিশেষ ধরনের প্রোটিন তৈরি করা। এই প্রোটিনগুলো মানুষ এবং জীবজন্তুর সুস্থ জীবনের জন্য একান্তই জরুরি। ডি এম ডি তখনই হয় যখন X ক্রোমোজমের একটি জিন ডিসট্রফিন প্রোটিন তৈরি করতে অক্ষম হয়।

আমি যখন খুব ছোটো তখনই আমার বাবা সন্দেহ করেন যে আমার ডি এম ডি আছে। অন্য সকলেই বললো— না। আমার যখন চার বছর বয়স হল তখন আমার বাবা-মা খেয়াল করল যে

আমি পড়ে গেলে নিজে থেকে উঠতে পারি না। আমার সিঁড়ি দিয়ে উঠতেও অসুবিধে হত। অতঃপর আমার মাংসপেশির বায়োপ্সি করা হল এবং রায় বেরোল ডি এম ডি।

স্কুলে আমি আর লাফাতে বা দৌড়াতে পারতাম না। ক্লাসের কিছু ছেলে আমার পেছনে লাগত। ওরা একদিন সিঁড়ি দিয়ে আমায় ঠেলে ফেলে দেয়। আমার এক বন্ধু সমর্থ চ্যাটার্জী আমাকে তুলে দাঁড় করালো। সমর্থ আমাকে অনেক ব্যাপারেই খুব সাহায্য করতো।

ন'বছর বয়সে আমি আবার পড়ে গেলাম। প্লাস্টার হল। দু'সপ্তাহ

আমার ব্যায়াম করাতে। গত একমাস আমার কোমরে বিচ্ছিরি ব্যথা হচ্ছে।

ডি এম ডি-তে আক্রান্ত সব বাচ্চাদেরই একই ধরণের সমস্যা হয়। শুনতে অবাক লাগবে কুকুরেরও এই রোগ হতে পারে এবং নেদারল্যান্ডের এক কোম্পানি এদের জন্য একটা ওষুধও বানিয়েছে। এই ওষুধের ট্রায়াল ইংল্যান্ডে হওয়ার কথা। আমার ভালো লাগে স্ট্যাম্প জমাতে, পশু পাখিদের নিয়ে বই পড়তে আর ভি ডি ও গেমস খেলতে। কিন্তু সবচেয়ে ভালো লাগে আমার প্রিয় সারমেয়ের সাথে খেলতে— স্কুবি ডুবি ডু।

প্রেসিডেন্ট ওবামা, একজন ভারতীয়র জীবনের দাম কত?

সোরাফেনিব (Sorafenib) ওষুধটাকে এখনও সবাই নেক্সাভার (Nexavar) নামেই চেনে। বায়ার নামে এক বিরাট বহুজাতিক কোম্পানি আরেকটি কোম্পানির সাথে যৌথভাবে এই ওষুধটা প্রথম তৈরি করে ও বাজারে আনে। ২০০৫ থেকে ২০০৭ সালের মধ্যে এই ওষুধটি কিডনি ও লিভারের কিছু ক্যান্সারের ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়। মুশকিল হল এদেশে ওষুধটির দাম বড্ড বেশি, মাসে খরচ পড়ে পাঁচ হাজার ডলার, বা আড়াই লাখ টাকা। ভারতীয় কোম্পানি ন্যাটকো এই ওষুধটাকেই বিক্রি করছে মাসে ন' হাজার টাকার কম দামে। আমেরিকার বড় সরকারি পদাধিকারিকেরা উঠে পড়ে লেগেছেন যাতে বায়ার কোম্পানি ওই চড়া দামেই ভারতে ওষুধ বিক্রির একচেটিয়া অধিকার পায়। ন্যাটকো-র কম দামি ওষুধ নাকি ওয়ার্ল্ড ট্রেড অরগানাইজেশন (WTO) চুক্তি বিরোধী। যে চুক্তিতে ভারতের মানুষের বিনা চিকিৎসায় মরা সুনিশ্চিত হয় যেটা কতটা নৈতিক সে প্রশ্নে যাচ্ছি না। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা তাঁর নিজের দেশের মানুষ যাতে কিছুটা কম দামে জীবনদায়ী ওষুধ পায় তার জন্য Affordable Care Act পাশ করিয়েছেন। অথচ ভারত বা অন্য দেশের ক্ষেত্রে তিনি মানুষ-মারা মুনাফার সমর্থক— এটা কেমন ব্যাপার? বছর দুয়েকও হয়নি তিনি আর তাঁর স্ত্রী মিশেল ভারতে এসে কত ভাল কথা বলে গেলেন, মিশেল নাচলেন অনাথ শিশুদের সঙ্গে— এসব কি কেবল পাবলিসিটি স্টান্ট?

সত্যি কথা বলতে কি, ভারতীয় কোম্পানি ন্যাটকো-কে এই ওষুধটাকে কম দামে বিক্রি করতে গিয়ে ভারত সরকার এমনকি WTO-র জনবিরোধী চুক্তি-খেলাপী কোনও কাজ করেননি। WTO চুক্তির যে আইনী ধারায় ভারত সরকার এটা করেছেন তার টেকনিকাল নাম হল "compulsory licensing" বা বাধ্যতামূলক লাইসেন্সদান। ভারতীয় কোম্পানি ন্যাটকো সোরাফেনিব ওষুধটাকে তৈরি করে বায়ার কোম্পানিকে ৬ শতাংশ লভ্যাংশ দিয়ে তবেই বিক্রি করার ছাড়পত্র পেয়েছে। WTO চুক্তি অনুসারে একটি দেশে যদি— (ক) জনগণের প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে, (খ) জনগণের কাছে যুক্তিযুক্তভাবে প্রাপ্তব্য ও (গ) সেই দেশে (ভারতে) যুক্তিযুক্ত পরিমাণে প্রস্তুত— এই তিনটি শর্ত মেনে তৈরি ও বিক্রির ব্যবস্থা যদি পেটেন্ট-অধিকারী কোম্পানিটি (বায়ার) না করে তাহলে সরকার অন্য কোনো কোম্পানিকে ওই ওষুধ তৈরি করার লাইসেন্স দিতে পারে। একেই বলে 'বাধ্যতামূলক লাইসেন্সদান'; আর ন্যাটকো-কে এদেশের সরকার সেটাই দিয়েছে।

মার্কিন সরকারের কথাবার্তায় মনে হতে পারে 'বাধ্যতামূলক লাইসেন্সদান' ধারাটি তাঁদের একেবারে না-পসন্দ। কিন্তু কিছু বছর আগে আমেরিকায় হিড়িক উঠেছিল সন্ত্রাসবাদীরা নাকি অ্যানথ্রাক্স জীবাণু ছড়িয়ে দিচ্ছে নানা উপায়ে। যদিও অ্যানথ্রাক্সে আক্রান্তের সংখ্যা একশো ছাড়ায় নি, মার্কিন সরকার 'জনস্বার্থে' এই বায়ার কোম্পানিকেই হুমকি দিয়েছিলেন— 'বাধ্যতামূলক লাইসেন্সদান' পদ্ধতিতে অন্য কোম্পানিকে দিয়ে সরকার ওষুধ বানিয়ে নেবেন। সেই হুমকির কাছে বায়ার নত হয়ে তড়িঘড়ি প্রভূত পরিমাণে অ্যানথ্রাক্সের বড়ি আধা-দামে সরবরাহ করেছিল। শেষ অবধি সে-ওষুধ কাজে লাগেনি, আর বায়ার-এর লাভই হয়েছিল। 'গট আপ গেম'? জানি না, তবে এরপর 'বাধ্যতামূলক লাইসেন্সদান'-এর বিরুদ্ধে পেশি-আস্ফালন সাজে না।

শিশুর মানসিক সমস্যা— কারা সমাধান করবে

শিশুটি স্কুলে যেতে চাইছে না... ভয় পাচ্ছে... নানা রকম শরীরের কষ্ট দেখিয়ে বাড়িতে থাকতে চাইছে, শুধুই বদমায়েসি? নাকি অন্য কারণ আছে। চিকিৎসার দায়িত্ব কি শুধু ডাক্তার আর মনোবিদের না আর কারোর— জানাচ্ছেন **মনোবিদ প্রিয়াঙ্কা ভট্টাচার্য**।

মানসিক রোগ একইভাবে প্রাপ্তবয়স্ক এবং শিশুদের আক্রান্ত করে। তফাৎ শুধু ছোটখাটো কিছু বিষয়ে। আর এগুলোই তফাৎ করে দেয় প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশুদের চিকিৎসায়। কাজেই এগুলো বোঝার দায়িত্ব চিকিৎসকের। কিন্তু চিকিৎসক হিসেবে কাজ করতে গিয়ে দেখা গেছে যে এই মানসিক রোগ চিকিৎসার কাজ একা চিকিৎসকের পক্ষে কার্যকর করা সম্ভব নয়। শিশুর পরিবার এবং স্কুল শিক্ষকদেরও এ সম্পর্কে চেতনা ও অংশগ্রহণ থাকা দরকার।

শিশু কী করে রোগাক্রান্ত হয়?

'ছেলেবেলার' বৈশিষ্ট্য হল এই যে, মানুষটি এখনও সম্পূর্ণ পরিণতি (maturity) লাভ করেন নি, একজন প্রাপ্তবয়স্ক যেভাবে সেটা লাভ করেছেন। আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির কাঠামোর প্রথম স্তর হল আক্রান্ত মানুষটিকে তার মানসিক রোগের বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে সাহায্য করা। অনেকটা ঠিক ছোটবেলায় শোনা রূপকথার রাজকুমারকে যেমন রাক্ষসের প্রাণ ভোমরার খোঁজ জানতে হয়। এইটি না জানলে রাজপুত্রের শত সাহসী প্রচেষ্টাও বৃথা হয়ে যেতে পারে। মনোবৈজ্ঞানিকের ভাষায় এই গুণটির নাম হল মনোশিক্ষা বা সাইকো-এডুকেশন (psycho-education)। বড়দের যত সহজে বৈজ্ঞানিক ভাষায় বুঝিয়ে দিলে তাঁরা তাঁদের পরিণত বুদ্ধির দ্বারা সেগুলি আত্মস্থ করে চিকিৎসায় নিজেদের সাহায্য করতে পারেন, ছোটদের পক্ষে এটা করা অত সহজ নয়। আশ্চর্যের ব্যাপার হল এই যে ছোটদের সেই একই 'রাক্ষস' বধ করতে হয়— কিন্তু স্বল্প পরিণতির ওপর ভরসা রেখেই।

একজন মানসিক রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে তার মস্তিষ্কের রাসায়নিক পরিবর্তনজনিত কারণ ছাড়াও আছে বিপর্যয় পরিস্থিতিতে পড়লে তার ভাববার/বোঝবার ভঙ্গী সংশোধনের উপায় সম্পর্কে ভাবনা প্রভৃতি কারণ। বিপর্যয় জীবনে আসা সাধারণ বিষয় কিন্তু সেটার মুখোমুখি হতে হলে উপযোগী আচরণ (adaptive behaviour) অবলম্বন করলে রোগাক্রান্ত হওয়াটা আটকানো যায়। আর তার অনুপোযোগী আচরণ (maladaptive behavior) গ্রহণ করলে রোগাক্রান্ত হয়। সেক্ষেত্রে মনশ্চিকিৎসা বা সাইকো-থেরাপি (psycho-therapy) করা হয়। মনশ্চিকিৎসার লক্ষ্য হল এই অনুপযোগী আচরণ 'শিক্ষামুক্ত' করে উপযোগী আচরণ 'শিক্ষা' দেওয়া।

শিশু বয়স থেকেই এই শিক্ষা শুরু। হয় তারা চারপাশের বড়দের দেখে শিখছে অথবা তাদের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে শিখছে। কোনো ঘটনার প্রেক্ষিতে তারা নিজের মানসিক অভিজ্ঞতায় মানে খুঁজে বার করে বড়দের প্রতিক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে। শিশুদের প্রয়োজনে প্রকৃত উপযোগী আচরণ শেখানো হয় সাইকোথেরাপির মাধ্যমে। কারণ অনুপযোগী আচরণ তাকে রোগাক্রান্ত করে তোলে।

শিশুটির সহযোদ্ধারা

তাহলে দেখা গেল স্বল্প পরিণতির (maturity) একজন মানুষকে এক অসম যুদ্ধে নামতে হচ্ছে। আর এখানেই লুকিয়ে আছে বিশেষ চিকিৎসা-ব্যবস্থার প্রয়োজন। চিকিৎসা পরিকল্পনায় কেবলমাত্র শিশুটিকে মাথায় রাখলে হচ্ছে না। তার মা-বাবা এবং পরিবারের অন্যান্য গুরুজনদের সচেতনতা এবং অংশগ্রহণ সমান গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে স্কুল-শিক্ষকের। যেহেতু শিশুদের জীবনের একটা দীর্ঘ সময় কাটে স্কুলে, শিক্ষকদের ভূমিকা এই চিকিৎসা ব্যবস্থায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মানসিক চিকিৎসা ব্যবস্থাকে বিহঙ্গম-দৃষ্টিতে (bird's eye view) দেখলে বোঝা যায় স্কুল-শিক্ষা কেবলমাত্র পুঁথিগত বিদ্যায় আর সীমিত থাকছে না। আমাদের শিশু রাজপুত্র/রাজকন্যাদের মন্ত্রি সভাসদ হয়ে সম্মান-সহ তাদের জীবনের লক্ষ্যে এগিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব বর্তায় সমাজের অনেকের উপর। এক মানসিক রোগাক্রান্ত শিশু কোনও মনোবিদের কাছে এলে তৈরি থাকতে হয় আনুসঙ্গিক বিদ্যার (যেমন স্পেশাল এডুকেটর, স্পিচ-থেরাপিস্ট, সাইকিয়াট্রিস্ট) সাহায্য নিতে।

তাহলে পরিবার, স্কুল শিক্ষক ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা সকলে হলেন শিশুটির সহযোদ্ধা এবং এই সকলের মিলিত চেষ্টায় তৈরি হয় সাইকোথেরাপি প্রোগ্রাম (psychotherapy programme)।

যুদ্ধের শত্রুপক্ষ

দৈনন্দিন প্র্যাকটিসে দেখা গেছে এই সমবেত চেষ্টার বিরুদ্ধে কিছু বাধা আছে। প্রথমত, এই প্রোগ্রামে বাবা-মা এবং স্কুল-শিক্ষকদের উপর কাজের চাপ বাড়ে। অনেক ক্ষেত্রে তারা সেই চাপ নিতে পারেন না। এছাড়া অনেক বাবা-মা সংস্কারবশত মানসিক রোগের চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রোগ্রামে তাদের শিশুটিকে নিয়ে যেতে সংকোচ বোধ করেন। আর একটি কারণ হল শিশুদের মানসিক সমস্যা সম্পর্কে অজ্ঞতা। যেমন বসন্তরোগে হাজার অস্বস্তি হলেও চামড়ায় আঁচড়ানো উচিৎ নয়, সেরকম বাচ্চাদের ব্যবহার জনিত সমস্যা হলে তাকে 'খারাপ ছেলে' বা 'অপদার্থ' ছাপ মারা উচিত নয়। সেটা সঠিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রতিকূলতা হিসেবে কাজ করে।

একটা উদাহরণ

সমগ্র আলোচনাটা একটা উদাহরণ দিয়ে দেখে নেওয়া যাক। রাহুল নামে একটা বাচ্চা ছেলে পেট ব্যথা ও বমির জন্য অনেকদিন ধরে সাধারণ চিকিৎসককে দেখাচ্ছে। কোন উন্নতি না হওয়ায় তাকে মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠানো হল। তার কিছু আবেগের সমস্যা দেখে মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ তাকে মনোবিদের কাছে পাঠালেন। মনোবিদ দীর্ঘক্ষণ কথা বলে বুঝলেন বাচ্চাটি স্কুলকে 'এড়াতে' চাইছে এবং ঘরে থাকতে চাইছে। আরও দেখা গেল রাহুলের একটি বিশেষ ধরনের শিক্ষা সমস্যা (specific learning difficulty)আছে— যেজন্য তার পক্ষে পড়াশোনা করা কঠিন হয়ে পড়ছে। রাহুলকে মনোবিদ সাইকোথেরাপি শুরু করলেন এবং স্পেশাল এডুকেটর তার শেখার সমস্যা সমাধানের জন্য বাড়িতে বিশেষ শিক্ষা দিতে শুরু করলেন। কিছুদিনের মধ্যেই (৩-৪টি সেশন) রাহুলের বেশ উন্নতি হল এবং তাকে আবার স্কুলে পাঠানো হল। কিন্তু পরের দিন থেকেই সে স্কুলে যেতে আপত্তি করল। ভালো করে খোঁজ নিয়ে দেখা গেল স্কুলে অন্যান্য সহপাঠীরা তাকে 'কাঁদুনে ছেলে' বলে খেপিয়েছে। শিক্ষকরা তাকে বকেছেন জোরে পড়তে পারে না বলে— তাছাড়া বলেছে 'তার মত ছাত্রের বস্তির স্কুলে পড়া উচিত, এরকম নামী স্কুলে নয়'। তার শিক্ষকরা জানতেনই না তার 'শেখার সমস্যা' আছে এবং সে 'বোকা' বা 'বদমায়েশ' নয়। স্কুলের ভীতি তার এমন পর্যায়ে গেল যে স্কুলের নাম শুনলেই ভয় পেত এবং সে ধীরে ধীরে উদ্বেগ-রোগের শিকার হয়ে গেল। তার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ল— মা-বাবা তাদের সব সমস্যার জন্য রাহুলকেই দায়ী করলেন। এবং হতাশ বাবা মা কোন কাজ হচ্ছে না বলে থেরাপি বন্ধ করে দিলেন।

কিন্তু রাহুলের অবস্থা এত খারাপ হয়ে গেল একবছর বাদে তাকে তার বাবা-মা আবার ডাক্তার দেখালেন। এবার মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ এবং মনোবিদ স্কুলের শিক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের রাহুলের সমস্যাটা বোঝালেন। সেখানে মানসিক রোগ সচেতনতা প্রোগ্রাম করলেন। এখন শিক্ষকরা রাহুলের সমস্যাটা বুঝলেন এবং সকলে একটা 'দল' হিসেবে কাজ শুরু করলেন। আরও দেড় থেকে দু'বছর লাগল রাহুলের সমস্যা সামলাতে— এখন সে তার পড়াশোনা ও দৈনন্দিন কাজ ভালোভাবে করে যাচ্ছে।

পরিশেষে বলা যায়— এখন হচ্ছে সর্বব্যাপী শিক্ষার (inclusive education) যুগ, কিন্তু শিশুর বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজনটা এতদিন শিক্ষা-প্রণালীতে প্রাধান্য পায়নি। তাই তাদের থেকে শতকরা একশ ভাগ কার্যকরী ফল আশা করা উচিত নয়। কিন্তু নতুন টিচার ট্রেনিং কোর্সে (teacher training course) এই বিষয়টির উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। এর প্রতিচ্ছবি তাদের চেষ্টায়, কার্যক্ষেত্রে পাওয়া যাচ্ছে। এখন প্রধান প্রয়োজন পরিবাবের সচেতনতা এবং এই যৌথ পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার জন্য যোগাযোগ।

লেখক পরিচিতি: প্রিয়াঙ্কা ভট্টাচার্য সাইকোলজিতে এম এ, এম ফিল করেছেন, বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থায় মনোবিদ হিসেবে প্র্যাকটিস করছেন। এছাড়া ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ-এর গেস্ট লেকচারার।

জল যেখানে মৃত্যুর কারণ

জলের এক নাম 'জীবন'। কিন্তু জল কখনো কখনো মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠতে পারে। তবে এই মরণ হঠাৎ করে হয় না। তিলে তিলে দগ্ধ হয়ে মরতে হয়। এরকম ঘটনা ঘটতে পারে জল খেয়ে। জলের মধ্যে ফ্লোরাইড থাকে, আর তার অভাবে দাঁত ঠিকমত গড়ে উঠতে পারে না। তাই অনেক ক্ষেত্রে পানীয় জল কিংবা দাঁতের মাজনের মাধ্যমে ফ্লোরাইড মেশানো হয় সেই অভাব পূরণ করার জন্য। এই ফ্লোরাইডের মাত্রা বেশি হয়ে গেলে বিপত্তি। ফ্লোরাইড ধীরে ধীরে দেহের মধ্যে জমা হতে থাকে ও ধীর বিষক্রিয়ার প্রভাব ফেলে সারা শরীরে— তাকে বলা হয় 'ফ্লোরোসিস'— লিখছেন **ডা. পি কে দাস**।

ফ্লোরোসিস'-র জন্য যে তড়িঘড়ি মৃত্যু হয় তা নয়, তিলে তিলে দগ্ধে মরতে হয়, খুবই বেদনাদায়ক। পঙ্গুত্ব নিয়ে সারাটা জীবন কাটে। ফ্লোরাইড যে মানুষের দেহে বিষক্রিয়া ঘটায়, এটা নিয়ে প্রথম গবেষণা করেন ভারতীয় বিজ্ঞানী অধ্যাপিকা সুশীলা। দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সে দীর্ঘদিন তিনি এই নিয়ে গবেষণা করেন। ফ্লোরোসিস গবেষণার কাজে তিনিই অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর গবেষণা থেকে জানা গেছে, ভারতবর্ষে ১৯টি রাজ্যে ফ্লোরোসিসের ব্যাপকতা বেশি। এই রাজ্যগুলির মধ্যে গুজরাট, রাজস্থান, অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, হিমাচল প্রদেশ, কাশ্মীর, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাবে বেশি পরিমাণে রক ফসফেট ও ফসফোরাইটস পাওয়া যায়, যার মধ্যে ফ্লোরাইড মৌল পাওয়া যায় ফ্লুরোস্পার হিসাবে।

ভূগর্ভস্থ জলে জিওমরফোলজিক্যাল কারণের জন্য ফ্লোরাইড মিশে থাকে। শহরাঞ্চল কিংবা গ্রামাঞ্চলের যে সমস্ত মানুষ নলকূপের জল ব্যবহার করে পানীয় জল হিসাবে তাদের দেহের মধ্যে ফ্লোরাইডের আধিক্য বেশি দেখা যায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ঘোষিত পানীয় জলে ফ্লোরাইডের নিরাপদ মাত্রা হল এক লিটার জলে ১.৫ মিলিগ্রাম। ভারতের ক্ষেত্রে এর মাত্রা হল প্রতি লিটারে ১ মিলিগ্রাম। অন্যান্য দেশেও এর ব্যাপকতা অনুযায়ী এই সহনমাত্রার তারতম্য দেখা যায়। যেমন পশ্চিম আফ্রিকায় এর মাত্রা হল ০.৫ মিলিগ্রাম প্রতি লিটারে, চিন কিংবা থাইল্যান্ডেএর মাত্রা হল ০.৫ মিলিগ্রাম প্রতি লিটারে।

মানব শরীরের সাধারণ বিপাকীয় প্রক্রিয়ায় পানীয় জলের মাধ্যমে যে ফ্লোরাইড প্রবেশ করে তার নিঃসরণ হয় মল, মূত্র, ঘাম, দুধ ও চুলের মাধ্যমে। বেশি মাত্রায় গ্রহণ করলে তা সম্পূর্ণ নিঃসারিত হতে পারে না, ফলে দেহের বিভিন্ন কোষ-কলায় জমতে থাকে ও ধীরে ধীরে তা বিষক্রিয়া ঘটাতে থাকে। একে বলে কিউমুলেটিভ টক্সিসিটি।

ফ্লোরাইডের প্রভাব—

কৃষিকাজে ফ্লোরাইড যুক্ত জল বেশি পরিমাণে ব্যবহার করা হলে কৃষিজ দ্রব্যের মধ্যেও ফ্লোরাইডের পরিমাণ বেশি হতে দেখা গেছে। ড. কে রাজলক্ষী ১৯৮২ সালে হায়দ্রাবাদের ইনস্টিটিউট অফ প্রিভেনটিভ মেডিসিনে এই ধরণের একটি সমীক্ষার কাজ করেন। দেখা যায় বজরা, ছোলা, তিল, যব, গম, ধান, কড়াইশুঁটি ও অন্যান্য শাক-সব্জির মধ্যে স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণে ফ্লোরাইডের সন্ধান পাওয়া গেছে।

ফ্লোরাইডের প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে গৃহপালিত জন্তু-জানোয়ারের উপরেও। তাদের দাঁত ভঙ্গুর হয়, ক্ষুধামান্দ্য দেখা দেয়, চামড়া খসখসে ও বিবর্ণ হয়ে যায়। হাড়ের সন্ধিস্থল ফুলে ওঠে, যন্ত্রণা হয় ও শক্ত হয়ে যায়। দুধের নিঃসরণ কমতে থাকে।

মানুষের দেহে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তাকে এক কথায় বলে 'ফ্লোরোসিস'। প্রথমে দাঁত অশক্ত হয় যাকে বলে ডেন্টাল ফ্লোরোসিস। দাঁতের ক্ষয় হয়। দাঁতের ঔজ্জ্বল্য কমে যায়। দাঁতের গায়ে হলদে ও বাদামি ছোপ ছোপ দাগ দেখা দেয়, কখনো কখনো দাঁতটা পুরো কালো রঙের হয়। এরপরে দাঁতে গর্ত হয় ও পরে দাঁত খসে পড়ে যায় অকালে। স্কেলিটাল ফ্লোরোসিস-এ রোগীর গাঁটে অসহ্য ব্যথা হয়, মাজা ও হাড়ের সন্ধিস্থল ফুলে ওঠে, ব্যথা হয় ও পেশির কার্যকারিতা কমে যায়। দুর্বল বোধ হয় হাঁটাচলায়। রোগ যত বাড়তে থাকে শিরদাঁড়া ও সন্ধিস্থলের লিগামেন্ট ও ইন্টার ওসিয়াস মেমব্রেনে ক্যালসিয়াম জমা হতে থাকে; যার ফলে শিরদাঁড়া নুয়ে পড়ে বেঁকে যায়, সন্ধিস্থল শক্ত হয়ে যায়। নড়াচড়ার ক্ষমতা থাকে না। একেবারে পঙ্গুত্ব অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

ফ্লোরোসিস নিয়ে কিছু প্রশ্ন

প্রশ্ন ঃ জলকে ফোটালে কি ফ্লোরাইড দূর হয়ে যায়?

উত্তর ঃ জলকে ফোটালে ফ্লোরাইড দূর হয়ে যায় না। উপরন্তু বেশি ফোটালে ফ্লোরাইডের মাত্রা আরও বাড়ে ও সেই জল পান করলে বেশি পরিমাণে ফ্লোরাইড দেহের মধ্যে ঢুকে বিষক্রিয়া ঘটাতে পারে।

প্রশ্ন ঃ বাজার চলতি ওয়াটার ফিল্টার ব্যবহার করে কি ফ্লোরাইড নিয়ন্ত্রণ করা যায়?

উত্তর ঃ বাজারে যেসব প্রচলিত ওয়াটার ফিল্টার আছে সেগুলো দিয়ে ফ্লোরাইড দূর করা যায় না। শুধুমাত্র R-O (রিভার্স ওসমোসিস) ওয়াটার পিউরিফাইং সিস্টেম ব্যবহার করে ফ্লোরাইড অনেকটা দূর করা যায়। তবে এটি ব্যয়বহুল, এর রক্ষণাবেক্ষণও যথেষ্ট খরচ সাপেক্ষ।

প্রশ্ন ঃ রান্নার জন্য কিভাবে নিরাপদ জল পাওয়া সম্ভব?

উত্তর ঃ যে এলাকায় লোক বাস করে সেখানে প্রথমে দেখে নিতে হবে কোন কোন নলকূপের জলে ফ্লোরাইডের মাত্রা বিপদমাত্রার নিচে আছে। সেইসব নলকূপের জল সবাই রান্নার কাজে ও পানীয়জল হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। আর যেসব নলকূপের জলে ফ্লোরাইডের মাত্রা বিপদমাত্রার ওপরে আছে সেইসব নলকূপের জল রান্না বা পানীয়জল হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। তবে কাপড় কাচা বা বাসন ধোয়ার কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রশ্ন ঃ কোন খাবারে ফ্লোরাইডের মাত্রা বেশি থাকে?

উত্তর ঃ ব্ল্যাক টি (দুধ ছাড়া চা) ও ব্ল্যাক লেমন টি-তে ফ্লোরাইডের মাত্রা বেশি থাকে। এগুলো এড়িয়ে যাওয়া ভালো। দুধযুক্ত চা খাওয়া ভালো ফ্লোরাইড এন্ডেমিক এরিয়ায়।

প্রশ্ন ঃ কোন নুন খাওয়া ভালো? সাদা নুন না কালো নুন?

উত্তরঃ সাদা নুন যেটাকে সোডিয়াম ক্লোরাইড বলা হয় সেটা খাওয়া ভালো, রান্নার কাজে ব্যবহার করা যায়। কালো নুন ভালো নয়, কেননা এতে প্রচুর পরিমাণে ফ্লোরাইড থাকে।

প্রশ্নঃ কালো নুন কোন কোন খাবারে মেশানো হয়?

উত্তর ঃ ডালমুট, চানা ডাল, নভরতন, পাপড়ী চাট, ভেলপুরী, পানীপুরী— এগুলোতে কালো নুন মেশানো হয় যার ফলে দেহের মধ্যে বেশি পরিমাণে ফ্লোরাইড ঢুকে যেতে পারে। তাই এগুলো না খাওয়াই ভালো।

প্রশ্ন ঃ কোন ধরণের মশলা খাবারে ফ্লোরাইড থাকে?

উত্তর ঃ চানা মশলা, চিকেন মশলা, সবজি মশলা, চাউ মশলা, জল জিরা মশলায় কালো নুন ব্যবহার করা হয় বেশি পরিমাণে। তাই এগুলো ফ্লোরাইডযুক্ত। এড়িয়ে চলা ভালো।

প্রশ্ন ঃ কোন কোন হজমি বড়ি খাওয়া ভালো নয়?

উত্তর ঃ হজমলা, হিঙ্গটি, সাইমোনায় ফ্লোরাইড-যুক্ত লবণ মেশানো হয়। খাওয়া ভালো নয়।

প্রশ্ন ঃ ফলের রসে কি ফ্লোরাইড থাকে?

উত্তর ঃ ফলের রস যখন সদ্য ফল নিংড়ে তৈরি করা হয় যেমন আনারস, তরমুজ, মুসাম্বি, আপেল, কমলালেবু, টমেটো ইত্যাদি— সেই রস খেলে কোনো ক্ষতির আশঙ্কা নেই। তবে রস যদি সংরক্ষণ করা হয় সেখানে 'প্রিজারভেটিভ' হিসেবে ব্যবহার করা হয় রঙিন রাসায়নিক পদার্থ ও ফ্লোরাইড, এইসব সংরক্ষকযুক্ত ফলের রস বেশি খেলে ক্ষতির আশঙ্কা থাকে।

প্রশ্নঃ যেসব টুথপেস্ট বা দাঁতের মাজনে ফ্লোরাইড থাকে সেগুলি কি ব্যবহার করা উচিত?

উত্তরঃ সমস্ত টুথপেস্ট ইত্যাদিতে ভারতীয় স্ট্যান্ডার্ড অনুমোদিত মাত্রার ফ্লোরাইড যোগ করা হয় না। এক্ষেত্রে ব্যবহারকারিদের টুথপেস্টটিতে ফ্লোরাইডের মাত্রা সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে তা যথাযথ কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েই ব্যবহার করা উচিত।

লেখক পরিচিতি: ডা. পি কে দাস, এম বি বি এস, ডি টি এম অ্যান্ড এইচ, একজন জেনারেল ফিজিসিয়ান ও ট্রপিক্যাল রোগ বিশেষজ্ঞ।

advt

সাধারণ অসুখবিসুখ ও ওষুধবিষুধ সম্বন্ধে জানতে পড়ুন—

ওষুধবিষুধ ও চিকিৎসার সরঞ্জাম

স্বাস্থ্যকর্মীদের নিত্যসঙ্গী হাতিয়ার

সংগ্রহ করবার ঠিকানা :

কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট মেডিসিনাল ইউনিট

৮৬সি, ডা. সুরেশ সরকার রোড,

কলকাতা - ৭০০ ০১৪

ফোন : ২২৬৫-২৩৬৩

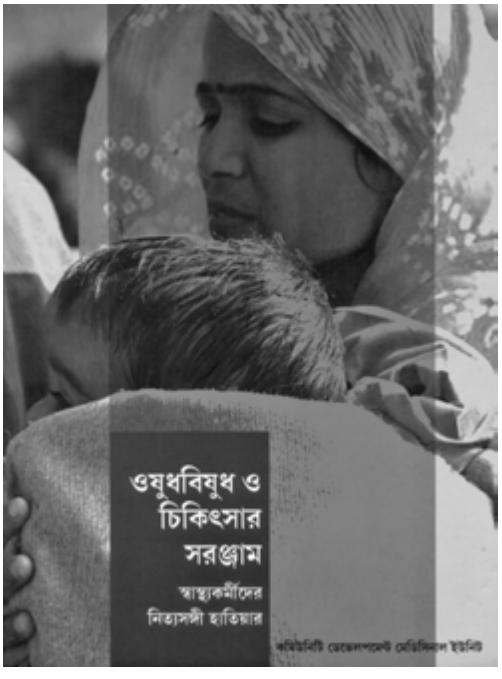

স্মরণে

শতবর্ষে
ডা. বিজয় কুমার বসু

ডা. রমেন্দ্রনাথ পাল

ডা. বিজয় বসুর সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক তেমন না থাকলেও তাঁর কর্মকান্ড আমার মত অনেক জনের রাজনৈতিক জীবন ও কাজকর্মকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। তাই জন্মশতবর্ষে তাঁর স্মরণে আমার ব্যক্তিগত কথাও এসে পড়বে। গত শতাব্দীর সাতের দশকের প্রথম দিকের ভীষণ দুঃসময়ে তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি আমাদের জীবনে অত্যন্ত সদর্থক ভূমিকা পালন করেছে। রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গের সাঁড়াশি-চাপে আমরা যখন বেশ কিছুটা দিশেহারা, জনগণের সাথে হৃত-সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করা, ন্যূনতমভাবে জনগণকে সংগঠিত করা এবং সর্বোপরি জনগণের সামনে নিজেদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব প্রমাণ করা ইত্যাদির জন্য উপযুক্ত পথ খোঁজায় যখন সকলে ব্যস্ত, ঠিক তখনই আমাদের মত সদ্য বিপ্লবী-রাজনীতিতে যুক্ত হওয়া, সবেমাত্র কুড়ি বছর বয়স পার হওয়া মেডিক্যাল ছাত্রদের কাছে তিনি আলোকবর্তিকার মত হাজির হলেন। ছাত্রজীবনে ও পরে ডাক্তার হয়ে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হিসাবে তাঁর গোপন ও অসীম-সাহসী কাজকর্ম, এবং আরও পরে কমিউনিজমের মহান আন্তর্জাতিকতাবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রামরত চীনা জনগণের সাহায্যে পাঠানো ভারতীয় মেডিকেল মিশনের অন্যতম সদস্য হিসাবে চীন দেশে যাওয়া, সেখানকার যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিক ও সাধারণ চীনা জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ, তাঁর অসম সাহসী কার্যকলাপ— এককথায় প্রতিবেশী দেশ চীনের জনগণের ঐরকম একটা ভয়ানক দুঃসময়ে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে চিকিৎসা করা এবং আহতদের সুস্থ করে আবার যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরিয়ে দেওয়া, নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে তাঁর এই মহান কর্মকান্ড আমাদের মনে গভীরভাবে দাগ কেটেছিল। আমাদের এগিয়ে যেতে উদ্দীপিত করেছিল।

চীন থেকে ফিরে

ডা. বসু চীনের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এসে কমিউনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে ত্রিপুরায় কাজ করেন। তারপর বিভিন্ন কারণে সক্রিয় রাজনীতি ত্যাগ করে কলকাতায় আকুপাংচার চিকিৎসা শুরু করেন। চীনের বিপ্লবের পরে তিনি সেদেশে আবার গিয়ে প্রাচীন ঐতিহ্যমন্ডিত আকুপাংচার চিকিৎসা শিখেছিলেন। তিনি আকুপাংচার চিকিৎসার ঐতিহ্য, তার কার্যকারিতা এবং এই চিকিৎসায় বিশেষ অর্থ ব্যয় না থাকার বিষয়টি সকলের সামনে তুলে ধরলেন। এই চিকিৎসাকে মাধ্যম করে জনগণের মধ্যে যাওয়া, তাদের রোগ নিরাময়ে কিছুটা সাহায্য করা এবং সর্বোপরি জনগণকে ন্যূনতম ভাবে সংগঠিত

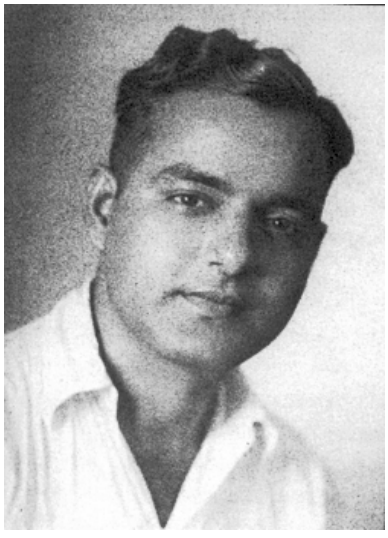

> তাঁর সরল, অনাড়ম্বর জীবনযাপন ছিল আমাদের কাছে আদর্শস্থানীয়

করার রাস্তা আমাদের কাছে খুলে গেল। তিনি কয়েকজনকে সরাসরি আকুপাংচার চিকিৎসা শেখালেন। বিপ্লব পরবর্তী চীনের স্বাস্থ্য আন্দোলন, ‘ Bare foot Doctor’-এর অভিজ্ঞতা তিনি সকলের কাছে রাখলেন। এর সাথে সাথে আকুপাংচার চিকিৎসাকে জনগণের কাছে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যম হিসাবে ‘ডা. দ্বারকানাথ কোটনিস স্মৃতিরক্ষা কমিটি’-কে পুনরুজ্জীবিত করলেন ১৯৭৩ সালে।

ডা. দ্বারকানাথ কোটনিস স্মৃতিরক্ষা কমিটি

চীন দেশে পাঠানো মেডিক্যাল মিশনের অপর এক সদস্য, ডা. বসুর সহযোদ্ধা, ছিলেন ডা. দ্বারকানাথ কোটনিস— তিনি চীনের যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদ হয়েছিলেন। তাঁর অসামান্য সেবাকর্ম ও চূড়ান্ত আত্মত্যাগকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য এই স্মৃতিরক্ষা কমিটি স্থাপিত হয়েছিল। ডা. বসুর সাথে আমার মত আরও অনেকেই জনগণের মধ্যে যাওয়ার মাধ্যম হিসাবে বিভিন্ন সময়ে এই কমিটিতে কাজ শুরু করেন। সারা বাংলা তথা ভারতে এই কমিটির প্রচার ও প্রসারে ডা. বসুর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাশ্চাত্য শিক্ষার M.B. ডিগ্রী থাকলেও ভারতে নতুন, চীনের প্রাচীন আকুপাংচার চিকিৎসাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করা তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় বহন করে। তাঁর সরল, অনাড়ম্বর জীবনযাপন ছিল আমাদের কাছে আদর্শস্থানীয়। ১৯৭৭-এ বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর সি পি এম নেতৃত্বের সাথে পুরানো সম্পর্কের সুবাদে ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার কোন চিহ্ন তাঁর মধ্যে দেখা যায়নি। এককথায় তাঁর সার্বিক জীবনশৈলী ছিল অনুসরণ যোগ্য।

১৯৭৭— বামফ্রন্টের ক্ষমতায় আগমন

১৯৭৭-এ বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর দমবন্ধ করা পরিস্থিতি কিছুটা দূর হল, ‘জরুরী অবস্থা’ উঠে গেল। ভারতে নতুন শাসকদল ক্ষমতায় এল। পশ্চিম বাংলায় সি পি এম নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট

> জীবনের মায়া ত্যাগ করে তাঁর এই মহান কর্মকান্ড আমাদের মনে গভীরভাবে দাগ কেটেছিল। আমাদের এগিয়ে যেতে উদ্দীপিত করেছিল।

ক্ষমতায় এসে অন্য শাসকদলের মতোই আচরণ শুরু করল। তবু এর মধ্যেই গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার কিছুটা সহায়ক পরিস্থিতি সৃষ্টি হল, আর সাধারণ শ্রমজীবি মানুষও লড়াই করার জন্য মানসিকভাবে কিছুটা তৈরী হল। এই অবস্থায় ডা.

কোটনিস স্মৃতিরক্ষা কমিটি ও তাঁর আকুপাংচার-কেন্দ্রিক কাজে সমবেত হওয়া রাজনৈতিক কর্মীরা ভেবেছিলেন জনগণের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত দাবী-দাওয়া, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিভিন্ন বিষয়ে গণ-আন্দোলন গড়ে তোলা, জনগণকে রাজনীতি সচেতন ও আন্দোলনমুখী করে তোলাই হবে কোটনিস কমিটির কাজ। এক্ষেত্রে ডা. বসু তাঁর পুরানো অবস্থানেই থেকে গেলেন। নিজেকে আকুপাংচার চিকিৎসার প্রচার-প্রসার-সরকারী স্বীকৃতি, ভারত-চীন মৈত্রী এবং ডা. কোটনিস স্মৃতিরক্ষা কমিটির গতানুগতিক কাজ ইত্যাদির মধ্যে নিয়োজিত রাখলেন। প্রধানত সংস্কারমূলক কাজের মধ্যেই সংগঠন যাতে আটকে থাকে তার জন্য তিনি সচেষ্ট ছিলেন। নিঃসন্দেহে এটি ছিল তাঁর সীমাবদ্ধতা।

শেষ কথা

পরিশেষে একথা বলতেই হয়, জীবনের শেষদিকের এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তাঁর স্মৃতি এখনো আমাদের প্রেরণা দেয়। পশ্চিম বাংলার ঐ কঠিন দুঃসময়ে আমাদের মত নতুন রাজনেতিক কর্মী ও জনস্বাস্থ্য কর্মীদের তিনি যেভাবে সাহায্য করেছেন, জনগণের সাথে একাত্ম হওয়ার যে নতুন রাস্তা দেখিয়েছেন এবং সর্বোপরি 'ডা. কোটনিস স্মৃতিরক্ষা কমিটি-র মত সংগঠন গড়ে তুলে তাতে বহু রাজনৈতিক কর্মী ও প্রগতিশীল মানুষকে ব্যাপক সন্ত্রাসের মধ্যেও জনগণের মধ্যে কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছেন তা এককথায় অতুলনীয়। তাঁর জীবন ও কর্মকান্ড থেকে পাওয়া অনুপ্রেরণা এখনও আমাদের কাছে পাথেয় হয়ে রয়েছে। আর তাই তিনি আমাদের কাছে চিরস্মরণীয়।

ডা. বিজয় কুমার বসুর সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী

- জন্ম— ১লা মার্চ ১৯১২, অধুনা বাংলাদেশের ঢাকা জেলায়। স্কুল জীবন থেকেই 'অনুশীলন সমিতি'র সদস্য। স্কুল শেষে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি।
- ১৯৩৫ সালে অবিভক্ত বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ এবং প্রথম আটজন সদস্যের মধ্যে একজন। ১৯৩৬ সালে এম বি পাস করার পর প্রথমে সার্জারি ও পরে ই এন টি বিভাগের সার্জেন। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে আহত কর্মীদের চিকিৎসার দায়িত্ব গ্রহণ এবং কমিউনিস্ট পার্টির গোপন কার্যকলাপের সক্রিয় কর্মী।
- ১৯৩৭ জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চীনা জনগণের মহান প্রতিরোধ যুদ্ধে সাহায্যের জন্য ভারতীয় কংগ্রেস কর্তৃক চীনে একটি মেডিকেল মিশন পাঠানোর সিদ্ধান্ত। এই মিশনের অন্যতম সদস্য হিসাবে চীন দেশে গমন।
- ১৯৩৯ চীনের প্রতিরোধ যুদ্ধের কেন্দ্র স্থল ইয়েনানে পৌঁছানো—চীন বিপ্লবের নেতা মাও সে তুং-এর সাথে সাক্ষাৎ।
- ১৯৪০-৪২ মেডিক্যাল মিশনের অন্য সদস্য ডা. দ্বারকানাথ কোটনিসের সাথে ভ্রাম্যমাণ মেডিক্যাল টিম তৈরী, যুদ্ধক্ষেত্রের খুব কাছে গিয়ে আহত সেনাদের সুস্থ করে তোলার লড়াই, অদম্য সাহস, কর্মদক্ষতা, নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের স্বীকৃতি স্বরূপ চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ। ১৯৪২ সালে চীনের যুদ্ধক্ষেত্রে সহযোদ্ধা ডা. কোটনিসের শহীদের মৃত্যুবরণ।
- ১৯৪৩-৪৬ ডা. বসুর কলকাতায় প্রত্যাবর্তন। কমিউনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে কাজ শুরু। চীনা জনগণের প্রতিরোধ যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ছড়িয়ে দেওয়া। বাংলার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ মোকাবিলা করার জন্য পিপলস্ রিলিফ কমিটির সক্রিয় কর্মী হিসাবে সারা বাংলায় কাজ।
- ১৯৪৭ দেশবিভাগ, ক্ষমতা হস্তান্তর— পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে কলকাতার উপকণ্ঠে মেটিয়াব্রুজে কাজ শুরু। কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষিত। ত্রিপুরায় আত্মগোপন ও সংগ্রাম।
- ১৯৫০ ভারত-চীন মৈত্রী সমিতি গঠন— প্রথম থেকেই সক্রিয় কর্মী।
- ১৯৫৮ বিপ্লব পরবর্তী চীনে গিয়ে আকুপাংচার চিকিৎসা পদ্ধতি শিক্ষা ও কলকাতায় প্রয়োগ শুরু।
- ১৯৬২ চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দু'ভাগ— কোন অংশে যোগ না দেওয়া— পার্টির সদস্যপদ পুনর্নবীকরণ না করা। পিপলস্ রিলিফ কমিটির সেবামূলক কাজ চালিয়ে যাওয়া।
- ১৯৭৩ ডা. দ্বারকানাথ কোটনিস স্মৃতিরক্ষা কমিটি পুনরুজ্জীবিত করা— জনগণের মধ্যে আকুপাংচার চিকিৎসার প্রসার ও ডা. কোটনিসের জীবনাদর্শ প্রচার। ভারত-চীনের জনগণের মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরী করার প্রয়াস।
- ১৯৭৭ আকুপাংচার অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া-র প্রতিষ্ঠা।
- ১৯৮০ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আকুপাংচার চিকিৎসা শিক্ষার কোর্সের উদ্বোধন।
- ১৯৮৬ ১২ই আগস্ট— কলকাতায় মৃত্যু।

(ডা. বিজয় কুমার বসু সম্পর্কে এই নিবন্ধটিতে প্রকাশিত বক্তব্য লেখকের নিজস্ব মত।)

লেখক পরিচিতি: ডা. রমেন্দ্রনাথ পাল কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে এম বি বি এস পড়ার সময় থেকেই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। পরবর্তীকালে দীর্ঘদিন ধরে সরকারি চিকিৎসক হিসেবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলন এবং স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার দাবিতে গড়ে ওঠা বিভিন্ন গণ আন্দোলনের সামনের সারিতে থেকেছেন।

গল্প

অনাগরিক

সাত্যকি হালদার

সন্ধ্যের মুখে হাসপাতালটায় চাপ অনেক কম। এমার্জেন্সির কাছে কয়েকজনের জটলা, সিঁড়িতে অপেক্ষা করা উদ্বিগ্ন মুখ, ফুটপাথের ওপর যে চা-দোকান সেখানেও রোগীর আত্মীয়রাই। তবে সেসব মিলিয়েও ভিড় তেমন নয়। সকালবেলা আউটডোর চলাকালীন যেমন গিজগিজ করে মানুষ, মেঝেতে পা ফেলাই দায়, সেই তুলনায় সন্ধ্যের পর হাসপাতাল অনেকটাই ফাঁকা।

জায়গাটা কলকাতার প্রান্তসীমায়। ঠিকানায় কলকাতা, তবু প্রশাসনিকভাবে জেলারই এক মহকুমা। হাসপাতালও তাই মহকুমা হাসপাতাল। কলকাতার দুই মেডিকেল কলেজ এখান থেকে দূরে নয়। সামান্য অসুখেও এখানের অনেকে তাই 'বড় জায়গায়' চলে যায়। তাছাড়া এই এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা যারা প্রভাব ও প্রতিপত্তিতে তারা কারো চাইতে কম নয়। ব্লক ও সেক্টর-এ বিন্যস্ত পুরো এলাকাটায় অসংখ্য প্রাসাদ, হরেক দেশি-বিদেশি গাড়ি, মাঝে মাঝে সুসজ্জিত পার্কও। ইদানিং বাইপাসের ধারে সগর্বে মাথা-তোলা প্রাইভেট হাসপাতালের দিকেই তাই এখানকার বাসিন্দাদের ঝোঁক। সামান্য টিটেনাস প্রতিষেধক নিতে হলেও এরা গাড়ি চড়ে ঝকঝকে হাসপাতালের সাজানো করিডোরে চলে আসে। মাঝরাত্তিরে বুকের যে কোনও দিকে সামান্য ব্যথায় টেলিফোনে অ্যাম্বুলেন্স ডেকে নেয়। তুলনায় সরকারি হাসপাতালটায় ভিড় করে থাকে এদিকে কাজে আসা কম আয়ের মানুষ। রাজারহাটে কাজ করা অজস্র নির্মাণ-কর্মি, নয়াপট্টির অটো ড্রাইভার কিংবা চিংড়িঘাটা থেকে ভ্যানরিক্সায় সবজি সাজিয়ে যারা উপনগরীর পথে হেঁকে বেড়ায় তারা বা তাদের বাড়ির লোকেরাই অসুখ-বিসুখে এখানে আসে। ঝকঝকে উপনগরীর কেন্দ্রে থেকেও এই মহকুমা হাসপাতাল তাই আলাদা এক চরিত্রের।

শীত আসি-আসি এক সন্ধ্যেয় রিক্সায় চাপিয়ে একটি ছেলেকে নিয়ে আসা হয় এখানে। ছেলেটির পরনে ময়লাটে জিনস ও শার্ট, মাথায় কোঁকড়ানো চুল। পেটের ব্যথায় বুকের মাঝখানে চিবুক ঠেকিয়ে রেখেছে সে। বছর পঁচিশের ছেলেটির সঙ্গে বয়স্ক একজন মহিলা, অন্য একটি কমবয়সি মেয়ে ছেলেটিকে গলা জড়িয়ে রিক্সা থেকে নামায়। দুজনে দুপাশ থেকে হাত ধ'রে, কখনও কাঁধের উপর ভর নিয়ে ছেলেটিকে কোনও রকমে এমার্জেন্সিতে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়।

দুপুর নাগাদ আউটডোর শেষ হওয়ার পর হাসপাতালের বাড়তি চাপ এমার্জেন্সিতে। দেরি করে আসায় প্রতিদিনই কিছু লোক আউটডোর পায় না। বিকেল নাগাদ তারা এমার্জেন্সিতে ভিড় জমায়। তাছাড়া সবসময়ই কিছু না কিছু রোগী ভর্তি থাকে। বিকেল বেলা ভিজিটিং আওয়ার্স-এ আসা বাড়ির লোকেরা এমার্জেন্সিটি খোলা পেয়ে রোগী সংক্রান্ত নানা কৌতূহল মেটাতে আসে। নানারকম খুঁটিনাটি বিষয় জানতে চায়। তবে ভর্তি থাকা রোগীদের বিষয়ে কোনও তথ্যই পাওয়া যায় না এখানে। এমার্জেন্সিতে বসা ডাক্তারবাবুর পক্ষে কখনোই তা জানা সম্ভব নয়। তবু বিকেলবেলা হাসপাতালের 'এনকোয়ারি' হিসেবে খানিকটা দায় সামলাতে হয় এমার্জেন্সিকে।

তবে সন্ধ্যে পার হলে আর সে দায় থাকে না। ভিজিটিং সময় শেষ হয়ে গেলে সারা হাসপাতালটাই অনেক ঢিলেঢালা। একটি-দুটি রোগী দেখা হয়ে গেলে ছোট ঘরটিতে বসা ডাক্তারবাবু বাসি খবরের কাগজ বা ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টান।

তবে সেদিন যিনি ছিলেন তিনি ডাক্তারবাবু নন, ডাক্তার দিদিমণি। হালকা নীল শাড়ির ওপর স্টেথোটি ঝুলিয়ে তিনিও কোনও বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিলেন। কুঁকড়ে যাওয়া ছেলেটিকে দেখে মুখ তুললেন তিনি।
— কী ব্যাপার?

ছোট ঘরটির ভিতরেই দেওয়াল লাগোয়া রোগী শোয়ানোর টেবিল। টেবিলের ওপর ময়লাটে সাদা শতরঞ্জি। নীলচে চুনকামের দেওয়ালে কাত হয়ে ঝোলা একটি ছক-কাটা ক্যালেন্ডার। ষাট পাওয়ারের ডুম জ্বলা ঘোলাটে ঘরটিতে দিদিমণিই একমাত্র ব্যতিক্রম। রোগী দেখে তার এগিয়ে আসা, চোখের নির্দেশে শুতে বলা ও মুহূর্তে ছেলেটির হাত তুলে নাড়ি দেখতে শুরু করা সবই বেশ অন্যরকম লাগে রোগী ও বাড়ির লোকজনের কাছে।
— দুপুর থেকে ব্যথা শুরু হয়ে গেছে।
— কোথায় ব্যথা? ছেলেটির বুকে স্টেথো বসিয়ে ডাক্তার দিদিমণি জানতে চান।

'ব্যথা হচ্ছে' ও 'ব্যথা শুরু হয়ে গেছে' শব্দ প্রয়োগের মৌলিক তফাত ডাক্তার দিদিমণির কাছে বেশ স্পষ্ট। ফলে ছেলেটির সম্বন্ধে বয়স্ক মহিলা যখন শুরু হয়ে গেছে বলেন তখন দিদিমণি স্বভাবতই 'কোথায় ব্যথা' জানতে চান। আর জানতে জানতেই একবার চেয়ে নেন ছেলেটির মুখ আর তলপেটের দিকে।

'কোথায় ব্যথা'র উত্তর আসে না কোনও। মুখ দেখেও কিছু আলাদা লাগে না। কিন্তু তলপেটে তাকাতেই দিদিমণির ডাক্তারি অভিজ্ঞতায় ধাক্কা লেগে যায়। নাভি জুড়ে সমস্ত তলপেটই আশ্চর্যরকম ফোলা। সামান্য হাত ছোঁয়াতেই বেশ টান লাগল পেটের চামড়া। সঙ্গে আসা বয়স্ক মহিলা বলে— আজ্ঞে পুরো মাস। তেমন হলে আপনি ভর্তি করে নেন।

টেবিলে শোয়া রোগীর চোখমুখে স্পষ্টই ব্যথার লক্ষণ। ডাক্তার দিদিমণির অবাক হওয়া নিয়েও ভাবান্তর নেই তার। ব্যথা বেড়ে যাওয়ায় সে আরও কুঁকড়ে যাচ্ছিল মাঝে মাঝে। সঙ্গের বয়স্ক মহিলা ডাক্তারের সঙ্গে কথোপকথনে ব্যস্ত, টেবিলে শুয়ে কাছে দাঁড়ানো কুড়ি-একুশ বছরের মেয়েটির হাত চেপে ধরছিল রোগী। মেয়েটিও মাথার কাছে দাঁড়িয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল তার। রোগী দেখা শেষ করে ডাক্তার দিদিমণি চটপট নিজের চেয়ারে ফেরেন। স্টেথোটি খুলে রাখেন টেবিলের ওপর। তখনও তার চোখে এক আশ্চর্য অবিশ্বাস। সেই অবিশ্বাস থেকেই হয়তো টেবিলে শোয়া রোগীর মুখে বারবার তাকান। ভর্তির টিকিট দেওয়ার সময়ও তার কৌতূহল স্বাভাবিক হয় না। বয়স্ক মহিলার হাতে ভর্তির কাগজখানা ধরিয়ে দিয়ে বলেন— দোতলায় লেবার ওয়ার্ড। রোগী আর কাগজখানা নিয়ে লিফট দিয়ে চলে যান। কাগজটা সরাসরি সিস্টারের হাতে দেবেন। ওনারাই যা লেখার লিখে দেবেন...।

কাগজ ধরিয়ে তিনি নিজেই চলে আসেন লিফটের সামনে। শ্যামলাল বলে ডাক দেন কাউকে। তারপর বোতাম টিপে লিফটের দরজা খুলে দেন।

যদিও তাঁর তাড়াহুড়ো অনুযায়ী রোগী নিয়ে আসতে পারে না দুজন। ব্যথায় কোঁকড়ানো রোগীকে টেবিল থেকে তুলতেই সময় লেগে যায়। তারপর সেই আগের মতো কাঁধে ভর করিয়ে লিফট পর্যন্ত আনা। রামলাল বা শ্যামলাল কারোই দেখা পাওয়া যায় না। অন্য কেউ এগিয়ে আসে না সাহায্যের জন্য। শুধু ডাক্তার-দিদিমণি চোখেমুখে উদ্বেগ নিয়ে লিফটের মুখে দাঁড়িয়ে উসখুস করতে থাকেন। ওরা লিফটে উঠে গেলে লাগিয়ে দেন দরজা। ভেতরে হাত গলিয়ে কী একটা বোতাম টিপে দেন। ওদের নিয়ে সামান্য ঝাঁকুনি দেওয়ার পর লিফট উঠে যায় দোতলায়।

কাগজ হাতে পেয়ে দোতলার সিস্টার সঙ্গে আসা মেয়েটিকেই লেবার রুমে নেওয়ার জন্য তাড়া দিচ্ছেলেন। কিন্তু সঙ্গে আসা একমাত্র ছেলেটিকে ওই দুই মহিলা এগিয়ে দিলে সিস্টারও ধন্দে পড়ে যান। গলা তুলে বলেন— ধ্যাত, এর আবার কী হতে যাবে!

কিন্তু মুখে ব্যথার ছাপ ও তলপেট দেখে তারও ধন্দ কাটে, কিংবা আরও ঘোর লেগে যায়।

রাতের হাসপাতালে মানুষের যাতায়াত কম। ভর্তি থাকা রোগীরা এক-দুজন করে করিডোরে পায়চারি করছে। কখনও খাতা হাতে কোনও সিস্টার

এক ওয়ার্ড থেকে অন্য ওয়ার্ডে চলে যান। খাবারের ট্রলি ঠেলতে ঠেলতে ভুঁড়িওয়ালা একটি লোক আসে আটটা নাগাদ। খোপ কাটা থালায় সাজানো ভাত-ডাল-ডিম একেকটি বেডে রেখে যায়। বন্ধ লেবার রুম থেকে মাঝে মাঝেই গলা ফাটানো চিৎকার ভেসে আসে। লেবার ওয়ার্ডের বাইরে বেঞ্চে বসা উদ্বিগ্ন দুজন নিজেদের লোকের গলা পায়, সঙ্গে গলা পায় অন্য মহিলাদেরও।

রাত আরেকটু বাড়লে ভেতরের সিস্টার হঠাৎই বাইরে চলে আসেন। বেঞ্চে বসা দুজনকে বলেন— পুরানো কাপড়-ন্যাকড়া এনেছ নাকি কিছু! থাকলে চটপট দাও।

ওদের মুখ চাওয়াচাওয়িতেই সিস্টার যা বোঝার বুঝে যান। লেবার ওয়ার্ডের দরজা ঠেলে মুহূর্তেই ভেতরে ঢোকেন। বাইরে বসা দুজন হঠাৎই ভেতর থেকে এবার বাচ্চার কান্না শুনতে পায়। তাদের পরিচিত রোগীর গলা একেবারেই চুপ। তুলনায় বাচ্চা একনাগাড়ে চিৎকার করে চলেছে।

তুলোর দলা নিয়ে সিস্টার বাইরে আসেন এবার। বলেন— লক্ষী মৃধার বাড়ির লোক...!

বেঞ্চে বসা দুজন তুলোর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। সিস্টার বলেন— দেখে নাও, কী বাচ্চা হয়েছে দেখে নাও...। তারপর ভেতরের আরও কিছু কাজ সারেন তিনি। কখনও ধমক দেন কাউকে। পরে ওয়ার্ডের ছোট ঘরটিতে ফিরে টেবিলে বসে খাতা নেন। ওদের দুজনকে ডাক দিয়ে বলেন—এসেই তো প্রায় হয়ে গেল। এবার বাকি বৃত্তান্ত বল দেখি। তোমরা কারা!

সঙ্গের বয়স্ক মহিলাই উত্তর দেয়। — আজ্ঞে আশেপাশের লোক।

— ওর স্বামীর নাম।

সঙ্গের দুজন মুখ চাওয়াচাওয়ি করলে সিস্টার চোখ তোলেন।

— স্বামীর নাম কিছু একটা তো বলবে!

এবার সঙ্গের মেয়েটি বিড়বিড় করে বলে— সে লোকটা ক'মাস হল ওকে ছেড়ে চলে গেছে...।

— তবু তো তার একটা নাম আছে।

— তা আছে। তাহলে লেখেন, ওই গণপতি।

— ঠিকানা?

— আজ্ঞে ১৩ নম্বর, দত্তাবাদ কলোনি।

পরদিন বিকেলে অন্যান্য ওয়ার্ডের সিস্টারদেরও ফিমেল ওয়ার্ডে ভিড় হয়। ডাক্তারেরাও কাজের ফাঁকে উঁকি দিয়ে যাচ্ছেন। দেওয়ালের দিক থেকে দ্বিতীয় বেডটির দিকে সবার নজর। সকালের পর থেকেই দুটি টিভি চ্যানেলে 'পুরুষ মা'কে দেখিয়েছে। সঙ্গে বিখ্যাত স্ত্রী-রোগ বিশেষজ্ঞ ও মনস্তাত্ত্বিকদের সাক্ষাৎকার। কথার ফাঁকে বেডে বাচ্চা নিয়ে শোয়া মাকেও দেখাচ্ছে বারবার। শার্টপ্যান্ট পরা মায়ের চেহারা, মাথায় ছেলেদের মতো কাটা চুল। তবে চোখ নামিয়ে যখন নিজের বাচ্চাকে দেখছে তখন সে একেবারে মা-ই। সিস্টাররা কেউ কেউ খুঁটিয়ে ওর বাড়ির কথাও জানতে চাইছে।

অপেক্ষাকৃত বয়স্ক এক সিস্টার ভিজিটিং আওয়ার শেষ হলে কাছে এসে বলেন— বাচ্চাকে দুধ দিবি না নাকি! ওকে খাওয়া, আমি দেখি।

মা বিড়বিড় করে বলে— খাওয়াইছি তো।

— আবার খাওয়া আমি দেখি।

মা উঠে বসে। বাচ্চাটি কোলে নেয়। জামার ওপরের কটা বোতাম খুলে ফেলল পরপর। সিস্টারের প্রবীণ চোখ তখন ঝুঁকে রয়েছে তার বুকে। বাচ্চাটি কচি দুই ঠোঁটে দুধ টানতে শুরু করলে তিনি বলেন— বাঃ, জিনিসপত্তর তো সবই ঠিকঠাক, তাহলে তুই ছেলে হলি কীভাবে!

মা তখন মুচকিমুচকি হাসে। মুখ ফুটে কিছুই বলে না। তার ক্লান্ত চোখ চেয়ে থাকে বাচ্চার দুধ খাওয়ায়। লেবার ওয়ার্ডে আর যে মায়েরা বাচ্চা নিয়ে শুয়ে-বসে তাদেরও চোখ বারবার দেওয়াল ঘেঁষা এই বেডটিতে ঘুরে যায়। কোনও উত্তর না পেয়ে সিস্টার বলেন— তুই আসলে ছেলে না, সবার মতো মেয়েই। ছেলেদের মতো সেজে থাকিস। কেন থাকিস?

নানারকম জটিলতা ও মিডিয়ার প্রচারে 'পুরুষ মা'কে চট করে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া যায় না। তাকে দেখতে, তার সঙ্গে কথা বলতে সমাজকর্মিরা আসেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানীদের ছোট একটি দল এক বিকেলে ঘুরে যায়। তারা মায়ের জেনেটিক-ম্যাপিং-এর কথা বলেন। এমনকি ভবিষ্যৎ গবেষণার কাজে মা তার ছেলেকে নিয়ে বিদেশে যেতে তৈরি কিনা তাও জানতে চান কেউ কেউ। তবে সব প্রশ্নের উত্তরেই ছেলে কোলে মা ক্লান্ত ভাবে হেসে যায়। কখনও অনেক প্রশ্ন শুনে বলে— যারা আমার পরে এল তারা সবাই বাচ্চা নিয়ে বাড়ি চলে গেছে। আমারে আপনারা ছাড়ার ব্যবস্থা করেন।

প্রথম দিনের সেই বয়স্ক মহিলা আর কমবয়সি মেয়েটি প্রতিদিনই সকাল-বিকেল আসে। টুকিটাকি খাবারের জিনিস দিয়ে যায়। বেডের পাশে টুলের ওপর বসে নতুন বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে দোল দেয়। মা তাদের কাছেও কাকুতিমিনতি ক'রে বলে— আর কিন্তু ভালো লাগে না আমার। না ছাড়লে এইবার একদিন পালিয়ে চলে যাব।

— কোথায় যাবি?

— কেন, ঘর যাব। বাপ-মার কাছে।

— গেলেও তোরে ওরা আবার খুঁজে বার করবে। তাছাড়া না জানিয়ে গেলে বাচ্চার জন্ম-সার্টিফিকেটও পাবি না।

— সে হোক গে। সার্টিফিকেট পরে দেখা যাবে।

বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞরা নতুন আবিষ্কারের আশায় বারবার এলেও 'পুরুষ মা' মুখ না খোলায় তেমন কিছু পান না। কিন্তু তাদের গবেষণার গেরোয় মাকে পনের দিনেরও বেশি থেকে যেতে হয়। ডাক্তাররাও তখন আর তাকে দেখতে আসেন না। শিশু-ডাক্তার নিয়মমাফিক বাচ্চার বুকে সামান্য একটু স্টেথো ছুঁইয়েই চলে যান। মায়ের বিরক্তি প্রায় চরমে ওঠে একসময়। বিরক্তি আর সেই সঙ্গে হতাশা। সঙ্গী দুজন দেখতে এলে বিকেলবেলা বলে— আমাকে কি তোমরা এখানেই রেখে দেবে! বড় ডাক্তারের কাছে গিয়ে হাত-পা ধরে বলতে পার না সব!

কিন্তু মা বিরক্ত হলেও সমাজবিজ্ঞানীদের গবেষণা শেষ হয় না চট করে। একেবারে কলকাতাতেই একজন 'রূপান্তরকামী'র দেখা পাওয়া, তাও শেষ পর্যন্ত যে মা হয়ে গেছে, একেবারেই হাতে চাঁদ পাওয়ার মতো। মায়ের সঙ্গের দুজন একদিন দুপুরে হাসপাতালের সুপারের কাছে ধর্ণা দিলে ভারি চেহারার মানুষটি চেয়ার ঘুরিয়ে বলেন— লক্ষী মৃধা এখন স্বাস্থ্য-ভবনের ফাইল। তারা না ছাড়লে আমি কিচ্ছু করতে পারি না।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারদের দিল্লির একটি দল যেদিন দমদমে অবতরণ করে সেদিন সারা হাসপাতালেই সাজোসাজো রব। ডেটল-ফিনাইলে করিডোর ধোয়া হয় তিনবার। সুপার নিজে ওয়ার্ড ও বাথরুম পরিদর্শন করেন। প্র্যাকটিসে ব্যস্ত যে ডাক্তারবাবুরা কথা বলার সময় পান না তারা রঙিন টাই পরে সুপারের ঘরে বসে কফি খান আর নিচু গলায় কথা বলেন। আর এই অতিব্যস্ততার মধ্যেই সন্তান-কোলে 'পুরুষ মা' কখন যে বেড থেকে হাওয়া হয়ে যায় তা কেউ খেয়াল করতে পারে না। এক পাশের সিঁড়ি দিয়ে সে নীচে নেমে আসে। তারপর নগরের পথে মিশে যায়।

সুপারের নির্দেশ মতো পুলিশ যায় ১৩ নম্বর দত্তাবাদের ঘরে। সেখানে তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। তারপর আরও কয়েকদিন পুলিশের যাতায়াত চলে। সবক্ষেত্রেই ভিড় করে কলোনির মেয়ে ও বউরা। যদিও পুলিশ শেষ পর্যন্ত কাউকে চিহ্নিত করতে পারে না।

লেখক পরিচিতি: ডা. সাত্যকি হালদার এম বি বি এস, ডি জি ও, পেশায় গাইনোকোলজিস্ট, বর্তমানে সরকারি হাসপাতালে কর্মরত, নেশায় লেখক ও প্রাবন্ধিক।

চলচ্চিত্রে ডাক্তার

ভিকি ডোনার—শুক্র লগ্নে লক্ষ্যভেদ

অংশুমান ভৌমিক

'স্বাস্থ্যের বৃত্তে'র গত চার সংখ্যায় সেকেলে সিনেমার ডাক্তারবাবুদের কাটাছেঁড়া পড়তে আপনাদের কেমন লাগছিল আপনারাই জানেন, লিখতে ভালোই লাগছিল। চার কিস্তি বেরোনোর পর সম্পাদক মশাই হুকুম দিলেন, টালিগঞ্জ পাড়া থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে আরব সাগরের তীরে আস্তানা পাততে। টালিনালার জল পানসে হয়ে আসছিল নির্ঘাত। লোনা জলে আর যাই হোক স্বাদ বদল তো হবে। কথা না বাড়িয়ে 'জো হুজুর' বলে লেগে পড়লাম। সম্পাদক বলেছিলেন মুন্নাভাই এম বি বি এস-এর কথা। আমার মনে আসছিল দিল এক মন্দির-এর কথা। ডক্টর কোটনিস কি অমর কহানি-র কথা। খামোশি, এমনকি আনন্দ আশ্রম-এর কথা। এমন একটা সময় ভিকি ডোনার নামে একটা সিনেমা রিলিজ করে সব হিসেব ওলটপালট করে দিল। এত তাড়াতাড়ি আনকোরা একটা সিনেমা নিয়ে লিখতে পারব এ স্বপ্নেও ভাবিনি। ছবিটা দেখা মাত্র মনে হল আপনাদের দরবারে এটাকে আচ্ছা করে নজরানা দিতে হবে। তারপর অন্য কথা।

আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ সিনেমাটা দেখেছেন নিশ্চয়ই। বেশি দিন হয়নি, ২০ এপ্রিল থেকে দেশ-বিদেশ জুড়ে মুক্তি পেয়েছে ভিকি ডোনার। ওই হপ্তায় মুম্বইতে ছিলাম। চার্চ গেট স্টেশনে নেমে নরিম্যান পয়েন্টে যাবার পথে ইরস থিয়েটার পড়ে। মুম্বইয়ের খানদানি সিনেমা। অবলীলাক্রমে মাল্টিপ্লেক্স কালচারের সঙ্গে পাঞ্জা কষে যাচ্ছে। দেখলাম প্রথম হপ্তায় বেলা দেড়টা আর সন্ধে পৌনে সাতটা—দুটো শো টাইম পেয়েছে ভিকি ডোনার। মজাদার পোস্টার। গন্ডা খানেক ন্যাপি পরা ছানাপোনার মাঝে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নায়ক। তার কোমরবন্ধে একটা ট্যাগ লাগানো। তাতে গোটা গোটা করে লেখা—'আই অ্যাম এ স্পার্ম ডোনার'। আমি শুক্রাণুদাতা। টাইটেল-এর লেটারিং-এও ডিম্বাণু নিষেকরত শুক্রাণুর ইঙ্গিত। যেমনটা অ্যানিমেশনে থাকে। সূক্ষ্ম হলেও ইঙ্গিতটা স্পষ্ট। চিহ্ন-সংকেত পড়ে নিতে পারলে কিঞ্চিৎ আমোদও হয়। কাউন্টারে খবর নিলাম। উইকএন্ড হাউসফুল গেছে।

বিষ্যুদবারের ম্যাটিনি শো-র সিকিভাগ টিকিটও খালি নেই। সেদিনই বুঝে গেছিলাম সুজিত সরকারের তিন নম্বর সিনেমার দম আছে। ইদানীং বলিউড মহল্লায় চোপরা-ভাট-জোহরদের সাজানো বাগানে দিব্যি করে খাচ্ছেন আমাদের অনুরাগ বসু, ওনির, অয়ন মুখোপাধ্যায়, দিবাকর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুজিত ঘোষ অ্যান্ড কোং। ফর্মুলা মাফিক সিনেমার ধারকাছ দিয়ে না গিয়েও পঞ্জাবিদের মৌরসিপাট্টায় ভাগ বসাচ্ছেন বঙ্গসন্তানেরা। সুজিত সরকার ভিকি ডোনারের পরতে পরতে বাঙালি বনাম পঞ্জাবি লড়াইটা আছে। কিন্তু সেটার কথা এখানে ফলাও করে বলব না। ভিকি ডোনার নিয়ে বড় একটা লেখা ফাঁদবার কারণ ইনফার্টিলিটি আর স্পার্ম ডোনেশন নিয়ে এত ভালো সিনেমা আজ অবধি হয়নি।

একেবারে হয়নি এমন নয়। একটা ছবির কথা তো এখনই মনে পড়ছে। গত বছরই দেখেছি। ওনিরের সিনেমা আই অ্যাম। তাতে চারটে গল্পের একটা গুলদস্তাঁ সাজিয়েছিলেন যাদবপুরের তুলনামূলক সাহিত্যের এই স্নাতকোত্তর। প্রথম গল্পটাই ছিল একজন হবু সিঙ্গল মাদারকে নিয়ে। তিনি মা হতে চলেছেন। ফার্টিলিটি ক্লিনিকে অনেক বলে কয়ে স্পার্ম ডোনারের পরিচয় পেয়েছেন। তার সঙ্গে আলাপ করেছেন। অনাগত সন্তানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গভীর কৌতূহল থেকে। এর বেশি কিছু নয়। তারপর ধরুন মাস দুয়েক আগে বেরোনো বাংলা সিনেমা ল্যাপটপ-এর কথা। সেখানেও ফার্টিলিটি ক্লিনিক নিয়ে অনেক লুকোছাপা ছিল। দার্জিলিং চা-বাগানের কুয়াশা তাকে আরও ঘোরালো করে তোলে। তফাত এই যে আই অ্যাম বা ল্যাপটপ-এ কোনো স্পার্ম ডোনারকে হিরো বানায়নি। আধুনিক নগর জীবনের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হয়ে বিষয়টা সিনেমায় এসেছে।

ভিকি ডোনার-এর মূল বিষয়টাই হল ইনফার্টিলিটির চিকিৎসায় একজন স্পার্ম ডোনারের ভূমিকা এবং তার সামাজিক স্বীকৃতির প্রশ্ন। বিষয়টা বেশ গুরুতর। ছবিটাও শুরু হয়েছিল এই বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটা বক্তব্যকে পরদা জুড়ে দেখিয়ে। কপালে ভাঁজ পড়েছিল। কিন্তু প্রথম শটেই ঘোর কেটে গেছিল। আমরা ঢুকে পড়েছিলাম দিল্লির লাজপত নগর কলোনির একটা আটপৌরে পঞ্জাবি বাড়িতে। বছর পঁচিশের ভিকি অরোরা (আয়ুষ্মান খুরানা) একেবারে কুঁড়ের বাদশা। চাকরি জোগাড় করা তার কম্মো নয়। বাবা অনেকদিন হল দেহ রেখেছেন। মা (ডলি আলুওয়ালিয়া) অনেক খেটেখুটে একটা বিউটি পার্লার চালাচ্ছেন। মর্জি হলে মায়ের পার্লারে গিয়ে দু-চারজন ক্লায়েন্টকে মাসাজ দেয় ভিকি। বাদবাকি সময়টা মৌজমস্তি করে বেড়ায়। নেশাভাং নয়, ক্লাবে গিয়ে ক্রিকেট খেলা আর এ মলে সে মলে আনাগোনা করতে করতেই ভিকির দিন চলে যায়। দিলদরিয়া ঠাকুরমা (কমলেশ গিল) নাতিকে আশকারা দেবেন, এ আর বিচিত্র কি! কিন্তু আত্মীয়স্বজনরা মোটে আমল দেয় না ভিকিকে। পাশের বাড়ির পেপসি আন্টিও না। পেপসি আন্টির মেয়ে লাগোয়া ছাদের আড়াল ডিঙিয়ে ভিকির ঘরে ঢুকে খিল তুলে দেবার ফিকির করলেও ভিকির তাতে মতি নেই।

এ হেন ভিকি ডক্টর বলদেও চাড্ডার (অনু কাপুর) নজরে পড়ে গেল একদিন। জহুরির চোখ চাড্ডার। নিজেই বলেন—শকল দেখ কে বান্দা কা স্পার্ম পহচান জাতা হুঁ! চাড্ডার ক্লিনিকে নিঃসন্তান দম্পতিরা আসেন। তাঁদের আবদারের আদি-অন্ত নেই। তাঁরা স্পার্ম ডোনারের প্রোফাইল জানতে চান। ঐশ্বর্য রাইয়ের মতো মেয়ে না হোক শচীন তেন্ডুলকরের মতো ছেলে না হলে তাদের চলে না। চাই ব্র্যাড পিটের মতো অয়স্কান্ত দেহসৌষ্ঠব। লেডি গাগার ভ্রূপল্লব। শাহরুখ খানের গ্ল্যামার উদগীরণ। রোজ রোজ ডিজাইনার বেবির ফরমায়েশ আসছে। মন্ত্রীসান্ত্রীরাও প্রার্থী। এদিকে এত ফলপ্রসূ শুক্রাণু পাবেন কোথায় ডাক্তারবাবু! চালাকচতুর ভিকিকে দেখে পেছনে ফেউ হয়ে লাগলেন তিনি। একদিন তালু ঠুকে বলেই দিলেন কেন এত খাতির করছেন তাকে। প্রথমটায় দুরছাই করলেও কদিন বাদে সায় দিল ভিকি। তার শুক্রাণু পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার জানিয়ে দিলেন একেবারে আলেকজান্দারকে ধরাধামে হাজির করেছেন বলদেও চাড্ডা। এমন স্পার্ম কাউন্ট লাখে একটা মেলে না!

ব্যাস! কপাল খুলে গেল ভিকির। ডাক পেলেই জামা মসজিদের লাগোয়া দরিয়াগঞ্জের ফার্টিলিটি ক্লিনিকে যায় সে। বীর্য ত্যাগ করে তাড়া তাড়া নোট নিয়ে আসে। না চাইতেই চলে আসে উপরি অনেক উপঢৌকন। ঘরদোরের ভোল পাল্টে যায়। ভিকি সবাইকে বলে বেড়ায় পার্টনারশিপে হ্যান্ডিক্রাফট এক্সপোর্টের ব্যবসা করছে। তাতেই এত বারফাট্টাই। অনেকদিন ধরে চিত্তরঞ্জন পার্কের একটা বাঙালি মেয়েকে (যমী গৌতম) মনে ধরেছে ভিকির। ব্যাঙ্কে কাজ করে মেয়েটা। নাম অসীমা রায়। বাঙালি-পঞ্জাবি এমনিতে আদায়-কাঁচকলায়। শেষমেশ তরে যায় সম্পর্কটা। বিষমমেরুর প্রেম গড়ায় বিয়েতে। কিন্তু যেদিন জানাজানি হয়, অসীমা শারীরিক অসুবিধার জন্য মা হতে পারবে না আর ভিকি বিয়ের আগে (এমনকি পরেও কয়েকবার) অর্থের বিনিময়ে শুক্রদান করেছে, সব গোলমাল হয়ে যায়। ঘরের মধ্যে তাড়া তাড়া নোটের গন্ধে পুলিশ আসে, শ্রীঘরে নিয়ে যায় ভিকিকে। কলকাতায় ফিরে যায় অসীমা। বাদবাকি গল্প বলে দেব না। স্পার্ম ডোনারের সামাজিক ও পারিবারিক স্বীকৃতির পথ কতটা সমস্যাসংকুল সেটা সুজিত সরকার আর তাঁর চিত্রনাট্যকার জুহি চতুর্বেদী যেভাবে দেখিয়েছেন, বাস্তবে তা আরও জটিল হলে অবাক হবার কিছু থাকবে না। যে দেশে স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বরাদ্দ সামরিক খাতে খরচের ব্যস্তানুপাতিক, সে দেশে এ ধরনের উটকো গতের কমেডি বানানো যাচ্ছে আর লাখে লাখে দর্শক সে সব দেখতে আসছেন এটা অবশ্যই ইতিবাচক দিক।

ভিকি ডোনার আদ্যোপান্ত একটা মজার ছবি। প্রাপ্তবয়স্ক/প্রাপ্তমনস্ক লেবেলের তোয়াক্কা করে না। রক্ষণশীলরা ভ্রূ কুঁচকে দেখা শুরু করলে শেষ করে থামবেন এমন তার চৌম্বক আকর্ষণ। চোস্ত সংলাপ লিখেছেন জুহি চতুর্বেদী। শুক্রদানের মধ্যে যে কোনো অন্যায় অপরাধ নেই, পুরাকালে সুলক্ষণাদের গর্ভসঞ্চারের জন্য হামেশাই যে বীর্যবান ধীমানদের প্রয়োজন পড়েছে, এখনও গুরুবাদের আড়ালে যে শুক্রদানের প্রথা চালু আছে, এ সবই ভিকিকে বুঝিয়েছেন ডাক্তার চাড্ডা। যেমন করে ছেলে ভোলাতে গল্প বলেন ঠাকুরমা-ঠাকুরদা, তেমন করে। বোঝাতে গিয়ে পরাশর মুনি, ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি, নিয়োগ প্রথার নাম পর্যন্ত ওঠেনি তার মুখে। ফলে মেসেজ-ড্রিভেন সিনেমার মতো একবারও ভারিক্কি হয়ে পড়েনি ভিকি ডোনার। শাগরেদের মাথা খাবার জন্য আলেকজান্দারের ব্লাড লাইনের সঙ্গে ভিকি অরোরার ব্লাড লাইনের একটা সরল সম্পর্ক পাতিয়ে দিয়েছেন ডাক্তারবাবু। তাতে আর্যরক্ত নিয়ে একটু বাড়াবাড়ি থাকলেও হাসির খোরাক আছে দেদার। তবু ব্যাপারটা স্পর্শকাতর ও যদ্দুর জানি নৃতত্ত্বের ধোপে টেঁকে না। সেমিটিক বা প্রোটো-অস্ট্রালয়েড জনগোষ্ঠী মনঃক্ষুণ্ণ হতে পারেন এমন অনেক কথা চিত্রনাট্যে বুনে দেওয়া আছে। ব্যাপারটা তাদের পক্ষে হজম করা অসুবিধাজনক। নাৎসি ইয়োরোপে এ ধরনের বাড়াবাড়ি কম হয়নি। হালফিলের পূর্ব ইয়োরোপের সিনেমাতে এ নিয়ে যথেষ্ট মস্করা করা হচ্ছে। ভিকি ডোনার-এর পরিচালক এটাকে নিয়ে এত আদিখ্যেতা না দেখালেই পারতেন। কমেডি বলে তাকে অ্যানথ্রপলজিক্যালি ইনকারেক্ট হতে হবে এমন দিব্যি কেউ দেয়নি। ভিকি ডোনার-এর প্রযোজকদের অন্যতম অভিনেতা জন আব্রাহাম। হাউস থেকে বেরিয়েই যত রাজ্যের নিঃসন্তান দম্পতিরা জন-সুলভ কিন্তু দেবদুর্লভ সন্তান আকাঙ্ক্ষা করে যদি নিকটবর্তী ফার্টিলিটি ক্লিনিকে হানা দেন তাহলে তো চিত্তির! সত্য সেলুকস, কি বিচিত্র এই দেশ!

আসলে এ সিনেমার জোরের দিক এত যে সব বিচ্যুতি ঢাকা পড়ে গেছে। বিষয়টার কথাই ধরা যাক। সারোগেট মাদারহুড নিয়ে অনেক সিনেমা হিন্দিতে হয়েছে। টেস্টটিউব বেবি নিয়েও হয়েছে। তপন সিংহের এক ডক্টর কি মউত নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব। সমান্তরাল ধারার বাইরে একেবারে মূলধারার বাণিজ্যিক সিনেমাও মাতৃত্ব ও পিতৃত্ব নানান বিকল্প পরিসরকে সর্বজনগ্রাহ্যতা দিয়েছে। এইডসের মতো কালান্তক ব্যাধির শিকারদেরও সামাজিক মান্যতা দেবার পক্ষে সওয়াল করেছে। ভিকি ডোনার এ পরম্পরায় উজ্জ্বল সংযোজন। মনে রাখতে হবে যে জনপ্রিয় সংস্কৃতি কোনো স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়কে নিয়ে নাড়াচাড়া করবার সময় তাকে দরকার মতো গড়েপিটে নেয়। সেটুকু আর্টিস্টিক লাইসেন্স তাকে নিতেই হয়। নইলে ডকুমেন্টারি আর ফিচার ফিল্মের তফাত করা মুশকিল হয়। ভিকি ডোনার-এর নির্মাতারা এ ব্যাপারে মাত্রাজ্ঞানের অভাব দেখাননি। পেশা হিসেবে শুক্রদানকে বৈধতা দেবার ঠিকে নিয়ে তাঁরা সিনেমা বানাননি। বরঞ্চ যারা স্রেফ রোজগারের ধান্দায় শুক্রদানে ইচ্ছুক তাদেরকে দু হাত নেওয়া হয়েছে।

রইল পড়ে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে স্পার্ম ডোনারের বোঝাপড়ার গভীরতার প্রশ্ন। ভিকি ডোনার-এর শিরদাঁড়া এটাই। ডাক্তার চাড্ডা যে ক্লিনিক চালান তাতে পয়সাকড়ির আমদানি ভালোই হয়। অথচ তাঁকে একবারের জন্যও অর্থগৃধ্নু মনে হয় না। ভিকি অরোরাকে তিনি ব্যবহার করেছেন, কাজে লাগিয়েছেন। এই ব্যবসার মধ্যে লাভ-ক্ষতির অঙ্ক প্রাধান্য পায়নি, সেবাধর্মই সামনে এসেছে। সুবর্ণহৃদয় না হলেও তাঁকে মোটের ওপর শ্রদ্ধার পাত্র করে গড়ে তোলেন চিত্রনাট্যকার-পরিচালক। রসিক তিনি। ভিকিকে কখনও কনফিউজ স্পার্ম, কখনও কমপ্লিকেটেড স্পার্ম আখ্যা দেন। আমরা হেসে কুটিপাটি হই। তিনি অকৃতদার। অথচ সংবেদনশীল। সিনেমার শেষে ভিকি যখন অকূল পাথারে পড়েছে, ডাক্তার চাড্ডাই এগিয়ে আসেন তাকে টেনে তুলতে, তার সামাজিক স্বীকৃতির পথ সুগম করতে। আধুনিক জীবনের বিপজ্জনক লক্ষণগুলোকে নিয়ে তিনি ভিকির সঙ্গে আলোচনা করেছেন। আসলে তাঁর শ্রোতা হয়েছি আমরা, সিনেমার দর্শকরা। এই বিপজ্জনক লক্ষণ থেকে যে স্বাস্থ্যসংকট ঘনাতে পারে তার নিরসনে ডাক্তারবাবুদের এমন ইতিবাচক ভূমিকার চলচ্চিত্রায়ন বলিউডের সিনেমায় বিরল নয়। যা

বিরল তা হল এই বহুস্তরী ডাক্তারবাবুর নির্মাণ।

জুন মাসের প্রথম হপ্তায় এ লেখা যখন ছাপাখানায় যাচ্ছে, তখন খবর নিয়ে দেখলাম ৫ কোটি টাকা বাজেটের ভিকি ডোনার এরই মধ্যে ৫০ কোটি টাকার ব্যবসা করে ফেলেছে। শোলে-র অন্যতম চিত্রনাট্যকার সেলিম খান একদিন সুজিতকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। খান সাহেব নাকি তাঁকে বলেছেন, এই চিত্রনাট্য কেউ তাঁকে লিখতে বললে তিনি সাফ 'না' বলে দিতেন। কিন্তু দেখবার পর তিনি হতবাক হয়েছেন। সুজিতকে তাঁর অমূল্য ফিল্মফেয়ার ট্রোফিটা উপহার দিয়েছেন খান সাহেব। বলেছেন, অন্য কারওর কাজ ভালো লাগলে তার হাতে ট্রোফিটা তুলে দিতে।

এই একটা সিনেমার ঠেলায় প্রায় শ্রবণ-নিষিদ্ধ 'স্পার্ম' শব্দটা শহুরে মধ্যবিত্তের শব্দ ভান্ডারে ঢুকে গেছে। সবার না হোক, কিছু লোকের মনের কোণে লেগে থাকা ময়লা ধারণাটা ধুয়ে মুছে এখন সাফ। ডাক্তাররাই জানিয়েছেন, স্পার্ম ডোনেশনের হার বেড়ে গেছে। চাহিদাও বাড়ছে উত্তরোত্তর। নিঃসন্তান যে সব দম্পতি ইতস্তত করছিলেন, তাঁদের একাংশ জোরকদমে ফার্টিলিটি ক্লিনিকের দোরে ধর্না দিচ্ছেন। টাইমস অফ ইন্ডিয়া-কে দেওয়া একটা সাক্ষাতকারে সুজিত জানিয়েছেন, ভিকি ডোনার-এর প্রস্তুতি পর্বে মুম্বইয়ের সব চাইতে পুরোনো স্পার্ম ব্যাঙ্কের কর্ণধার ডক্টর মালপানির পরামর্শ নিয়েছিলেন তাঁরা। সিনেমার প্রোমোশনে ওই ডাক্তারবাবুর ভিজিটিং কার্ডটা কাজে লাগানো হয়েছিল। ভিকি ডোনার সাড়া জাগানোর পর ডাক্তারবাবু ফোনে ফোনে জেরবার হয়ে যাচ্ছেন। সারা দেশের লোক তাঁর স্পার্ম ব্যাঙ্কে শুক্রদান করার জন্য কাতার লাগিয়েছেন।

বর্তমান কলমচি ডাক্তার নন। ভিকি ডোনার-কে মাথায় তুলতে গিয়ে স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘন হয়েছে কিনা সে ব্যাপারে হলফনামা যাঁরা দিতে পারেন তাঁদের তরফ থেকে কোনো ওজর আপত্তি হয়েছে বলে খবর নেই। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত একটা সদর্থক ভাবনাকে এভাবে জনসাধারণের মধ্যে পৌঁছে দেবার জন্য কেন্দ্রিয় উদ্যোগে অনেক সিনেমা আগে তৈরি হয়েছে। নির্মাতাদের মধ্যে শ্যাম বেনেগালের মতো কৃতবিদ্য চলচ্চিত্রকারও আছেন। সেগুলো কতদূর সফলতা পেয়েছে তার কোনো সমীক্ষা হয়েছে কিনা আমার জানা নেই। কিন্তু ষোলআনা মুনাফাখোর মুম্বাইয়া সিনেমা হয়েও যে সংবেদনশীলতা, সংযম ও সংলগ্নতা নিয়ে আমাদের মনের জানালা ধরে উঁকি দিয়ে গেল ভিকি ডোনার, তার তুলনা মেলা ভার!

ডাক্তার চাড্ডার ফার্টিলিটি ক্লিনিকে প্রথম শুক্রদানের পর যেদিন এক লপতে অনেকগুলো টাকা পেয়েছিল ভিকি অরোরা, একগোছা ফুল কিনেছিল সে। পছন্দের এক মেয়ের বাড়ির সদর দরজায় কড়া নেড়ে সেই ফুল তার হাতে তুলে দিতে চেয়েছিল। 'কী করা হয় শুনি?' জবাবে একগাল হেসে ভ্রূ নাচিয়ে যেই না 'আই অ্যাম স্পার্ম ডোনার' বলেছিল ভিকি, তক্ষুনি সপাটে থাপ্পড় পড়েছিল তার গালে। কদিন বাদে এক কফিশপে একই ঘটনার অ্যাকশন রিপ্লে হয়েছিল।

আগামী দিনে এমন ঘটনা যে আকছার হবে না, সেটুকু অন্তত নিশ্চিত করে দিয়েছে ভিকি ডোনার! নয় নয় করে ৫৩ খানা ছানার জন্মের পেছনে কলকাঠি নেড়েছিল সে। কম কথা!

লেখক পরিচিতিঃ অংশুমান ভৌমিক— শিক্ষক, সাংবাদিক ও শিল্প-সমালোচক।

advt

শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ ও সুন্দরবন কমপ্রিহেনসিভ এরিয়া ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ সেন্টার-এর যৌথ উদ্যোগে কেনা হল একটি মোটর চালিত নৌকা।

সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকে রোগী পরিবহন ও মেডিকেল টিমের যাতায়াতের জন্য ব্যবহৃত হবে এই যানটি।

এই নৌকাটি কেনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছেন দেশ বিদেশে থাকা শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগের বন্ধুরা।

ট্যুরিস্ট সিজ্‌নে নৌকাটিকে ভাড়া দিয়ে উপার্জিত অর্থে সুন্দরবন সীমান্ত স্বাস্থ্য পরিষেবার খরচ চালানো হবে।

কম খরচে সুন্দরবন ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন—

সম্পাদক, শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ,

ফোন : ৯৮৩০৯২২১৯৪

মনতোষ মণ্ডল, সম্পাদক, সুন্দরবন কমপ্রিহেনসিভ এরিয়া ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ সেন্টার, ফোন : ৯৪৭৭৪৯৪৩৯১

বই পড়া

কাবুলের পথে পথে

পান্থজন

আনন্দ পাবলিশার্স

‘কাবুলের পথে পথে’, ২০৭ পাতার বই, লেখক পেশায় ডাক্তার, পান্থজন ছদ্মনাম ব্যবহার করে তিনি নিজেকে নিজের পেশার বাইরে দেখার চেষ্টা করেছেন— অনবরত। সমালোচনায় দিলীপ ব্যানার্জী

‘কাবুলের পথে পথে’ বইটি ভাষার কারিকুরিতে না গিয়ে রোজনামচার ভঙ্গিতে লেখা—তর তর করে না পড়ে এই বই রাখা যায় না। পান্থজন তাঁর লেখায় সদ্য তালিবানদের হাত থেকে মুক্ত হওয়া আফগানিস্তানের চিত্র তুলে ধরেছেন।

২০০১, খুচরো ওয়ারলর্ডদের সাথে দেশের বিভিন্ন কোণে তখনো বোঝাপড়া চলছে ইন্টারিম সরকারের। অরাজকতা, অনাহার, স্বাস্থ্য, শিক্ষা সব ভেঙে চুরমার, সূর্য ডুবলে কাবুল অন্ধকার, সঙ্গে কার্ফু, দেশ জুড়ে চোর ডাকাতের লুঠতরাজ। এ হেন অবস্থায় পান্থজন তার পেশাকে অক্ষুণ্ণ রেখে আফগানিস্তানের একটা সার্বিক চিত্র তুলে ধরেছেন সেটা যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে। ঝরঝরে বাংলা বইটার গুণগত মান বাড়িয়েছে অবশ্যই।

মাদার, মাদার টু, কাবুলিয়ালার সন্ধানে, বা বিদায় এ-গুলো ছিটকে বেরিয়ে আসা রোজনামচা থেকে অসাধারণ গল্প, সৈয়দ মুজতবা আলীর ‘চাচা কাহিনী’কে মনে করিয়ে দেয়। বইটিতে স্থান কালের বিবরণ ও চরিত্র বিন্যাসের স্বকীয়তা পাঠকের মনে সৃষ্টির ছাপ রাখবে আশা করি। আমার বিশ্বাস দেশ ও পরিস্থিতির বিবরণ পাঠকরা শুধুমাত্র অনুধাবন করবেন তাই নয়, বইটি পড়তে পড়তে সে সময়ের আফগানিস্তান যেন স্পষ্ট দৃশ্য হয়ে ভেসে উঠবে পাঠকের চোখের সামনে। আনন্দ পাবলিশার্সের প্রকাশনায় দুশো টাকা মূল্যের ‘কাবুলের পথে পথে’ বইটির নাম এবং মান দুটোই সমতুল্য। তবু সমালোচনার তাগিদে দু-চারটা কথা বলা দরকার। ‘সেইদিন’ গল্পটার কিছু মেরামতি দরকার। পরবর্তি প্রকাশনার সময় এটা আমার আর্জি, লেখক ভেবে দেখতে পারেন। শুধু প্রবল প্রতাপ বা রাজীব গুপ্তা নয়, মোট ছয়জন ভারতীয় সাংবাদিক একসাথে একসঙ্গে মধ্যরাতে আমুদরিয়া পেরিয়ে তাজিকিস্তান থেকে প্রথম আফগানিস্তানে ঢোকেন। তাঁরা হলেন বিষ্ণু সোম, অজয় শুক্লা

(এন ডি টিভি), রাজ চেঙ্গাপ্পা এবং স্বয়ং বর্তমান সমালোচক। প্রবল প্রতাপ, রাজীব গুপ্তা আমাদের সঙ্গে ছিলেন।

২০০০ সালে কাবুলের ওপর মার্কিন গোলার আঁচ আমরা আমুদরিয়ার তীরে বসে পেয়েছি। দুশানবে (তাজিকিস্তানের রাজধানী) থেকে প্রায় ১০০ গাড়ির কনভয় চলেছে, গাড়ি ভর্তি সাংবাদিক, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আসা। আমাদের যেতে হবে আমুদরিয়ার তীরবর্তি গ্রাম কোকুল। এখান থেকে নদীটা পেরোলেই খোজাবাউদ্দিন, আফগানিস্তান— নর্দান এ্যালায়েন্সের স্ট্রংহোল্ড। দুশানবে থেকে বর্ডার পেরোনোর সরকারি অনুমতি নিয়ে বেরোতেই বেশ বেলা বয়ে গেল। এছাড়া পথে বিভিন্ন চেক পোস্টে একের পর এক বাধায় নদীর তীরে যাওয়ার আগেই রাত নেমে এল। প্রান্তিক শহরের পুলিশের একটা গাড়ি আমাদের পথ দেখিয়ে আগে আগে চলতে লাগল। আমাদের আগেই বলা ছিল যখন আমরা সীমান্তের রাস্তায় ঢুকবো তখন কোনো মতেই গাড়ির হেডলাইট জ্বালানো চলবে না। একটাও হেডলাইট জ্বললে অপর প্রান্ত থেকে পাহাড়ের উপর বসে থাকা তালিবানের গোলায় মৃত্যু অবধারিত।

ফিকে জ্যোৎস্নার রাত, চারিদিকে দেখতে দেখতে চলেছি, পরিত্যক্ত খোলা মাঠ, মাঝ মাঝে গুমটি ঘর, বোধহয় সীমান্তরক্ষীর জন্য। হঠাৎ একটা জোর ব্রেক কষে সবকটা গাড়ি স্তব্ধ। একদম পেছনের দিকে আমাদের গাড়ি, কিছু বোঝবার আগেই ফের আমাদের চলা শুরু। দুপাশে কাঁটাতারের বেড়ার মাঝখানের অপরিসর রাস্তা দিয়ে আমাদের গাড়িগুলো চলতে লাগল আমুদরিয়ার দিকে। খরস্রোতা নদী তর তর করে এগিয়ে চলেছে হাজার হাজার বছরের ইতিহাসকে সঙ্গে নিয়ে। ফিকে জ্যোৎস্নায় ও পারটা দেখতে পাচ্ছি, এবার পেরোতে পারলে হয়!

গাড়ি থেকে নেমে নদীর পাড়ে একটা নোঙর করা বার্জে উঠে বসলাম আমরা ছয়জন, সাথে আরো শ-খানেক সাংবাদিক, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা। টর্চের যৎসামান্য আলোয় এক এক করে সবার পাসপোর্ট পরীক্ষা করে দেখছে রাশিয়ান গার্ড। ১৯৯১ তাজিকিস্তানে গৃহযুদ্ধের সময় তদানিন্তন সরকার রাশিয়ান গার্ডের সাহায্য নেয় সীমান্ত সুরক্ষার জন্য। অবশেষে আমুদরিয়ার উজান বেয়ে মধ্যরাত্রে যুদ্ধবিদ্ধস্ত আফগানিস্তানে প্রবেশ। জায়গাটার নাম খোজাবাউদ্দিন।

এটা নর্দান এ্যালায়েন্সের শক্ত ঘাঁটি। ফিকে জ্যোৎস্নায় তালিবান-বিরোধী সেনার কুচকাওয়াজ, সারি সারি টি-থারটিফোর ট্যাঙ্কের নল শত্রুর দিকে তাক করা, এ কে ফরটি-সেভেনের ঝনঝনানি, এ এক ভয় মাখানো অস্বস্তিকর যুদ্ধের রাত। এক ডলারের বিনিময়ে এক লক্ষ আশি হাজার আফগানি মুদ্রা, ভোর থেকে বাচ্চা বুড়োদের রুটির জন্য লাইন, মাথার উপর আমেরিকান যুদ্ধ-জাহাজের গর্জন, সাথে বোমাবাজি

তালিবানদের ডেরায়, টার্গেট ভুলে নিরীহ অসহায় লোকের মৃত্যু। আকাশ থেকে মার্কিন গোলা, জমিতে নর্দান এ্যালায়েন্সের আক্রমণে তালিবানরা দিশেহারা হয়ে পালালেও সুন্দর করে মাইন বিছিয়ে যেতে ভুল করেনি। আমরা নর্দান এ্যালায়েন্সের অতিথি, এই যুদ্ধের মধ্যেও আমাদের দেখভাল করার আপ্রাণ ও আন্তরিক চেষ্টা। মরুভুমির মধ্যে একটা মাটির বাড়ি, দুটো ঘরে আমাদের ছয়জনের থাকার ব্যবস্থা, কাঁচা মাটির গন্ধ আর ফেটে যাওয়া মাটির দেওয়াল। তার কারণ অবশ্য সহজেই অনুমেয়, বাড়িগুলো চটজলদি তৈরি, বোমায় বিদ্ধস্ত গ্রামটিতে।

সকাল পাঁচটা থেকে ছয়টার মধ্যে আমাদের জন্য চলে আসত জলখাবার, আফগানি রুটি আর ক্রিম, দুপুরে খাওয়ার কোনো ঠিক ছিল না, সন্ধ্যায় বরাদ্দ ছিল এক বালতি হলুদ আর মাংস মাখা ভাত, ওটাকে কোনো অজানা কারণে পোলাও ভাবতে হত! ছয়জনের জন্য থালা বাসন তো দূর-অস্ত, চামচের অভাবে অগত্যা বালতিতে কবজি ডুবিয়ে খাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না।

আফগান-তাজিক সীমান্তে পলায়নরত তালিবানদের ধরপাকড় ও মৃত্যুর সংবাদ প্রতি মুহূর্তে। তালিবানদের হাত থেকে একের পর এক শহর কব্জা করছে নর্দান এ্যালায়েন্স, কাবুলে জোর লড়াই চলছে, ঠিক করলাম এবার কাবুলের দিকে রওনা দেওয়া যাক। একটা জিপ ভাড়া করে মালপত্র ঠেসে, ঠাসাঠাসি করে চললাম কাবুলের দিকে। রাস্তায় খবর পেলাম হাইওয়ে জুড়ে তালিবানের পাহারা, দোভাষী খালেদ জানাল অন্য একটা রাস্তার খবর, সেটা একটু দুর্গম কিন্তু তালিবানদের এড়িয়ে কাবুলের দিকে এগোনো সম্ভব। আন্দাজ দুশো কিলোমিটার যেতে আমাদের ছয়দিন ও পাঁচ রাত লেগেছিল। আমাদের সতর্কতা, ঝুঁকি আর ভয়ংকর অভিজ্ঞতার কথা এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক। বরঞ্চ আমরা পান্থজন আর তাঁর লেখা 'কাবুলের পথে পথে' বইটিতে ফিরে আসি।

নস্টালজিয়া-আক্রান্ত বইটি রোমান্টিকতায় ভরা, লেখকের মানবিক মনের পরিচয় প্রতিটি ছত্রে। ছোটবেলায় ৬০-৭০ দশকে, কলকাতার অলিতে গলিতে পাঠানের হাঁক, আখরোট, পেস্তা, বাদাম, কিসমিস এবং আরো কিছুর ঝোলা কাঁধে ফিরি করে বেড়ানো। ওদের বিশ্বাসযোগ্যতা কলকাতার মানুষের কাছে ছিল সন্দেহের অতীত। মিনির রহমতুল্লাকে লেখক আফগানিস্তানের কোণে কোণে খুঁজে পেয়েছেন এবং প্রতিটি গল্পে দেশটির প্রতি ভারতবাসীদের ভালোবাসা আর যুগ-যুগের সম্পর্কের উল্লেখ রয়েছে প্রায় প্রতিটি পাতায়। লেখকের বইটায় উল্লিখিত বিবরণ থেকে জানা যায়, বহু বছরের যুদ্ধের ফলে, আফগানিস্তানের পরিকাঠামো ভেঙে চুরমার। এর থেকে হাসপাতালও রেহাই পায়নি।

আফগানিস্তানে পান্থজনের নয় মাস

জং পড়া ছুরি-কাঁচি, দরজা-জানালা উধাও, ও টি (অপারেশন থিয়েটার) চট দিয়ে কোনো রকমে ঘেরা, অ্যাম্বাসাডারের নখকুনির অপারেশন সোফায় শুইয়ে সারা বা 'যা থাকে কপালে' বলে গলব্লাডার সার্জারি জেনারেল অ্যানাস্থেসিয়া ছাড়াই করে ফেলা। শুধু তাই নয়, ধুলো ঝেড়ে জল দিয়ে ও টি সাফাই করা, এছাড়া ভাঙাচোরা মেরামত করতে রাজমিস্ত্রি বা কার্পেন্টার লাগানো ও তদারকি করা— সবই করতে হয়েছে লোকের অপেক্ষায় না থেকে। দেশটির প্রতি ভালোবাসা, সহানুভূতির সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ক্লান্তিহীন চিকিৎসার জন্য ডাক্তারবাবুকে সেলাম।

কাবুলের হাসপাতালে কাতারে কাতারে রোগী দেখা, অপারেশন— এছাড়া নানারকম কাজকর্মের আর শেষ নেই। এর ফাঁকে যখনই সময় পেয়েছেন ঘুরে বেড়িয়েছেন আফগানিস্তানের বিভিন্ন জায়গায়। হেলথ ক্যাম্পের সূত্রে বামিয়ান, মাজার-এ-শরিফ, জালালাবাদ, গার্দিস, পাক্তিকা সর্বত্র পান্থজনের সঙ্গী কলম, কাগজ আর (অনুমান করি) ক্যামেরা এবং অনুসন্ধিৎসার চোখে ধরা পড়েছে যুদ্ধোত্তর দেশের রাজনৈতিক সমীকরণ, সংস্কৃতি, দেউলে হয়ে যাওয়া দেশের মানুষের দৈনন্দিন বেঁচে থাকার লড়াই। এছাড়া আছে তালিবানিহীন আফগানিস্তানে হিজাব পরিহিতা মেয়েদের দেশ গঠনের অঙ্গীকার, পুরুষদের সাথে পাল্লা দিয়ে। তালিবান অনুশাসনে মেয়েদের একলা বাড়ি থেকে বেরোনোর বিরুদ্ধে ফতোয়া ছিল। পরিবারের সাথে যদি বা বেরোনো যেত তা আবার বোরখায় আপাদমস্তক মুড়ে, অন্যথায় বেত্রাঘাত, জেল বা জরিমানা। এ সবই লেখক উপস্থাপনা করেছেন বইটিতে। ডামাডোলের বাজারে সাহস সঞ্চয় করে কখনও কাবুলে আফিং-চরসের আসরে, সুফি গানের আড্ডায় বা রিশখোরে তালিবানদের ট্রেনিং ক্যাম্পে এবং ওসামা বিন লাদেনের বাড়ি দেখতে যাওয়া আবার কখনো বামিয়ানে হাজারাদের আড্ডায়— পান্থজনের ঝুলি ভরে উঠছে অভিজ্ঞতায়।

কাবুলের পথে পথে পান্থজনের লেখায় ঘুরে ফিরে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক ও তার বাঁধনের গল্প। আজিম ব্যারাকপুরের ছেলে, আফগান সুন্দরীর প্রেমে পড়ে ভারতবর্ষের সীমানা ছাড়িয়ে কাবুলে সংসার পেতে বসেছে। জাবাদ রুবিনার প্লেটনিক প্রেমের গল্প। বা চুঁচুড়ার ডাক্তার রুমা মৈত্র এক আফগান পাঠানের প্রেমে পড়ে আমিনা, এবং পাক্তিকার এক প্রত্যন্ত গ্রামে দুই সন্তান নিয়ে ঘর আর ডাক্তারি সামলাচ্ছেন। পান্থজনের প্রেমে ও টি নার্স আরিফার হাবুডুবু আর জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার গল্প ও মায়েরার ফিস-ফিসানি— নো ইউ ডোন্ট নো, শি ভেরি সাই, বাট শি টেল মি, শি লাইক ইউ এ্যান্ড সি লাভ ইউ, আই অলসো লাইক ইউ, বাট অনলি লাইক ইউ, বাট শি লাভ ইউ, শি টেল মি।

পান্থজন আপনি কোথায়?

লেখক পরিচিতি: দিলীপ ব্যানার্জী চিত্র সাংবাদিক। ২০০০ সালে যুদ্ধের সময় মাসখানেক আফগানিস্তানে ছিলেন। ২০০১ সালে আবার ফিরে যান। গত দশ বছরে বহুবার তিনি আফগানিস্তানে গেছেন।

ধর্ম-জাতপাত-অযুক্তি-কর্তৃত্ব ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আপনার যুক্তিবাদী মননচর্চার দীর্ঘদিনের সাথী advt

একুশ শতকের যুক্তিবাদী

পড়ুন ও পড়ান।

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির কেন্দ্রীয় মুখপত্র।

চিঠিপত্র

মাননীয়
সম্পাদক, **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**

মহাশয়,
'স্বাস্থ্যের বৃত্তে' পত্রিকার ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত সোমা মুখোপাধ্যায়ের 'কাদম্বিনী বসু থেকে ডক্টর গাঙ্গুলি' রচনার প্রসঙ্গে এই পত্রের অবতারণা।

লেখিকা তাঁর রচনায় সুন্দর তথ্যনির্ভরভাবে মেডিক্যাল কলেজের প্রথম ছাত্রী কাদম্বিনী গাঙ্গুলির জীবন ও কর্মকান্ড তুলে ধরেছেন। এই প্রজন্মের মানুষের কাছে এই ধরনের রচনার যথেষ্ট ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে।

আলোচ্য রচনার উপর কয়েকটি বিষয় এখানে উল্লেখ করছি।

১. লেখিকা লিখেছেন যে, কাদম্বিনী চোদ্দ বছর বয়সে কলকাতায় 'হিন্দু বিদ্যালয়'-এ ভর্তি হন যা পরবর্তীকালে 'বেথুন স্কুল' নামে পরিচিত হয়। এই প্রসঙ্গে জানাই যে, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে কাদম্বিনী 'হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ে' ভর্তি হন। সেই বিদ্যালয়ের নাম বদল হয়ে হয় বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়। সেই সময় কলকাতার হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় ও বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় উভয় প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন কাদম্বিনীর পিতা ব্রজকিশোর বসুর ভাগ্নে প্রখ্যাত ব্যারিষ্টার মনমোহন ঘোষ। এই সময় বেথুন কলেজ কমিটির সভাপতি বিচারপতি রিচার্ড গার্থ বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ের সঙ্গে বেথুন স্কুলের মিলন ঘটান। স্বাভাবিকভাবেই কাদম্বিনী বসু বেথুন স্কুলের ছাত্রী হন।

২. লেখিকা উল্লেখ করেছেন যে, আত্মীয়তার সূত্রে তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। এই প্রসঙ্গে জানাই যে, কাদম্বিনীর স্বামী দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম পক্ষের কন্যা ছিলেন বিধুমুখী গঙ্গোপাধ্যায়। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সাথে এঁর বিবাহ হয়। এঁদের তিন কন্যা— সুখলতা, পুণ্যলতা ও শান্তিলতা। আর দুই পুত্র— সুকুমার ও সুবিনয়। এই সুকুমারেরই পুত্র সত্যজিৎ রায়।

৩. লেখিকা উল্লেখ করেছেন যে, ডা. রাজেন্দ্র চন্দ্র চন্দ্রের কাছে কাদম্বিনী প্র্যাকটিক্যালে ফেল করেন মাত্র এক নম্বরের জন্য। এই প্রসঙ্গে জানাই যে কাদম্বিনী প্র্যাকটিক্যালে নয় মৌখিক পরীক্ষায় মাত্র এক নম্বরের জন্য ফেল করেছিলেন।

৪. লেখিকা লিখেছেন যে কাদম্বিনী এডিনবরা থেকে LRCP উপাধি পেয়ে স্বদেশে ফিরে আসেন। এই প্রসঙ্গে জানাই যে এডিনবরা থেকে LRCP ছাড়াও কাদম্বিনী গ্লাসগো থেকে LRCS এবং ডাবলিন থেকে DFPS ডিগ্রী নিয়ে দেশে ফিরে আসেন।

৫. লেখিকা লিখেছেন যে ১৮৮৯ সালে কাদম্বিনী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন ও তিনিই প্রথম মহিলা প্রতিনিধি যিনি কংগ্রেসের অধিবেশনে বক্তব্য পেশ করেন। এই প্রসঙ্গে জানাই যে, ১৮৮৯ সালে কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনে বোম্বাই শহরে কাদম্বিনী ও রবীন্দ্রনাথের ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবী যোগদান করেন। ১৮৯০ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে কাদম্বিনী সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রসঙ্গে ইংরাজীতে একটি বক্তৃতা দেন।

৬. লেখিকা তাঁর রচনায় জীবনের শেষ দিনের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু শেষ দিনটির তারিখ উল্লেখ করেন নি। সেই দিনটি ছিল ১৯২৩ সালের ৩ অক্টোবর।

আলোচ্য রচনার শিরোনামের সাথে উল্লিখিত আছে যে, প্রথম মহিলা ডাক্তার কাদম্বিনী গাঙ্গুলি। এই প্রসঙ্গে জানাই যে, কাদম্বিনী গাঙ্গুলি প্রথম মহিলা যিনি ডাক্তারি পড়া শুরু করেন। কিন্তু ১৮৯০ সালে বিধুমুখী বসু ও ভার্জিনিয়া মেরী মিত্র কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে প্রথম স্নাতক হন। ভার্জিনিয়া মেরী মিত্র প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯০৪ সালে ডা. পূর্ণচন্দ্র নন্দীর সাথে তাঁর বিবাহ হয়। বিবাহের পর ইনি স্বামীর মহিলা রোগীদের পরীক্ষা করতেন, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে প্র্যাকটিস করতেন না।

ধন্যবাদান্তে
সীতাংশু কুমার ভাদুড়ী
শ্রীরামপুর, হুগলী

সম্পাদক
স্বাস্থ্যের বৃত্তে

'স্বাস্থ্যের বৃত্তে'-র জুন-জুলাই '১২ সংখ্যায় ডা. আশীষ কুমার কুন্ডুর লেখা 'ভগবান নিদ্রা গিয়েছেন' শীর্ষক চিঠির প্রেক্ষিতে এই চিঠি। প্রথমেই বলি 'ডাক্তাররা ভগবান' এমন ধারণা সাধারণ মানুষের মনের গভীরে যে গেঁথে আছে তার বাস্তব ভিত্তি যথেষ্ট জোরালো। কোনো ব্যক্তি নিজে বা প্রিয়জন মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়লে, ছুটতে হয় ডাক্তারের কাছে— ডাক্তার হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যাঁর কাছে নিজেকে বা প্রিয়জনকে সঁপে দিতে হয়— আর সবচাইতে প্রিয় যে জীবন তাকে রক্ষার দায়িত্ব ডাক্তারকেই দিতে হয়। ডাক্তার বহু চেষ্টার পর 'সাক্ষাৎ মৃত্যু'র হাত থেকে সেই রোগীকে বাঁচিয়ে তুললেন— আর তখন একজন সাধারণ মানুষ ডাক্তারকে ভগবান ছাড়া আর কার সাথে একাসনে বসাতে পারেন? সুতরাং বহুদিন ধরে লালিত এই ধারণার সবটাই কল্পনাপ্রসূত নয় বা সিনেমার তৈরি করাও নয়। অবশ্য এর সঙ্গে ভগবান সত্যিই আছেন কিনা বা তিনি আর্তের উদ্ধারে কতটা হাত বাড়িয়ে দেন, সে প্রশ্নের কোনো সম্পর্ক নেই; এ হল সাধারণ মানুষের বিশ্বাসের ভগবান।

ডাক্তাররা যেহেতু সাধারণ মানুষের জীবন-মৃত্যুর সাথে সরাসরি সম্পর্কিত, ডাক্তারদের কাছে সাধারণ মানুষের দাবীও অনেক বেশি (অফিসের বড়বাবু জাতীয় পেশার ব্যক্তিদের কাছে যা আশা করা বাতুলতা)— এই দাবীগুলি কখনো কখনো যৌক্তিকতার সীমাও ছাড়িয়ে যায়— আর তা পূরণ করতে না পারলে ডাক্তাররা প্রায়শই 'খলনায়কে' পরিণত হন। এর পিছনে ইন্ধন যোগায় একদিকে সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার অপ্রতুলতা, সবকিছুর বাণিজ্যিকীকরণ, তেমনই অন্যদিকে ডাক্তারদের একটা বড় অংশের সাধারণ মানুষের জীবনের প্রতি সহানুভূতিহীনতা, বাণিজ্যিকীকরণের স্তম্ভে পরিণত হওয়া। ব্যক্তিগত লাভের জন্য যেকোনো ধরণের দুর্নীতিতে অংশগ্রহণে পিছপা না হওয়া— সবকিছু মিলিয়ে স্বাস্থ্য-চিকিৎসাব্যবস্থার চরম 'মাৎস্যন্যায়' ক্রমবর্ধমান। তবে সুখের কথা সমাজে নিষ্ঠাবান ডাক্তারদের (ডা. কুন্ডুর সংজ্ঞানুযায়ী) সংখ্যাও কম নয়— যাঁরা বর্তমান আর্থসামাজিক অবস্থায় সীমিত

রসদের সাহায্যে হতদরিদ্র মানুষের কাছে যে সেবা পৌঁছে দেন তা এককথায় অতুলনীয়। তাঁদের এই কাজের মধ্যে অবশ্যই সীমাবদ্ধতা আছে, তবে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় তাঁদের কর্মকান্ড সাধারণ মানুষের জীবন-যন্ত্রণাকে উপশম করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট কার্যকরী ভূমিকা নেয়। তাই তাঁরা এই মানুষজনদের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র এবং কখনো বা 'ভগবান'। সুতরাং ''আজকের আর্থসামাজিক পরিবেশে একজন ডাক্তার কি করতে পারেন? প্রায় কিছুই না''—এই বক্তব্য একপেশে।

তবে এখানেই শেষ হওয়া উচিত নয়। আরও একটু এগিয়ে পেশার গন্ডি ছাড়িয়ে, খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-চিকিৎসা-শিক্ষার মতো পাঁচটি মৌলিক দাবীর ভিত্তিতে সমাজে চলমান আন্দোলনগুলির অংশীদার হওয়ার ক্ষেত্রে (যেভাবে ডা. কুন্ডু ছত্তিশগড়ে শংকর গুহনিয়োগীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা আন্দোলনের শরিক হয়েছিলেন) ডাক্তাররা কিছুটা ভূমিকা রাখতে পারলে আরও ভালো হয়।

ডা. রমেন্দ্রনাথ পাল
মেটিয়াব্রুজ
কলকাতা ৭০০০২৪

মাননীয় সম্পাদক
'স্বাস্থ্যের বৃত্তে' সমীপেষু,

পত্রিকার পঞ্চম সংখ্যাটি সুন্দর হয়েছে। বিশেষ করে একজন নিদানতত্ত্ববিদ হিসাবে ডা. জয়ন্ত দাসের একক প্রবন্ধ এবং ডা. সর্বাণী চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর আরেকটি প্রবন্ধ অতি তথ্যসমৃদ্ধ, মনোরম ও যুক্তিনিষ্ঠ। 'মল-মূত্রের চিকিৎসক' হিসাবে চিহ্নিত প্যাথোলজিস্টদের তরফ থেকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ। অন্যান্য প্রতিটি লেখা তথ্য ও সাহিত্যগুণে ঋদ্ধ। তার বর্ণনা করে পত্রিকার মূল্যবান স্থান ও অর্থের অপচয় করতে চাই না।

বিশেষত একটি পত্রের সম্পর্কে দু-চার কথা বলার জন্য এই পত্রের অবতারণা। ডা. আশীষ কুমার কুন্ডুর সুলিখিত ও যুক্তিনিষ্ঠ পত্রাঘাত 'ভগবান নিদ্রা গিয়েছেন'—প্রসঙ্গে। প্রথম প্রশ্ন সম্পাদকীয় নীতি নিয়ে। পদাধিকারবলে ডা. কুন্ডু পত্রিকার উপদেষ্টা। পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁর উপদেশ কি সম্পাদক ও কার্যকরী সম্পাদকের 'বধির কর্ণে' প্রবেশ করছে না? তা না হলে উপদেষ্টাকে পত্র মারফৎ পত্রিকার প্রবন্ধ নির্বাচন সম্পর্কে সমালোচনা জানাতে হয় কেন? ডা. কুন্ডু লিখেছেন, 'এ হেন পরিস্থিতিতে ডাক্তারদের ভগবান সদৃশ মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ করে ''স্বাস্থ্যের বৃত্তে'' কি বৃত্তে ঘুরতে চাইছে বোধগম্য হচ্ছে না।' এ তো শ্রী মনোজ মিত্রের 'বাবুদের ডালকুকুরে' নাটকে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারা স্বয়ং নিজ মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধেই অনাস্থা আনার সমান! এই আলোচনা ও নীতি নির্ধারণ কি উপদেষ্টা ও সম্পাদকদের প্রাক-পত্রিকা প্রকাশ আলোচনাসভায় হতে পারত না? স্বাস্থ্যের বৃত্তের পরিসরে অতি গণতন্ত্রীকরণ দেখে আমার মতো অর্বাচীন পাঠক হতবাক।

ব্যক্তিগত ভাবে শ্রী অংশুমান ভৌমিকের প্রবন্ধগুলি (এখনও অবধি বোধহয় তিনটি প্রকাশিত) আমার কাছে মনোগ্রাহী হয়েছে। জনপ্রিয় চলচ্চিত্রের বিশ্লেষণ এবং ফেলে আসা কৈশোর যৌবনের স্মৃতি রোমন্থনে সমৃদ্ধ লেখাগুলি। চিকিৎসকদের ঈশ্বর বানাবার বিতর্কিত বিষয় অবশ্যই চর্চার দাবি রাখে। আমারও মত মানুষ তাদের পেশাজীবি হিসাবে গ্রহণ করলেই ভালো। কিন্তু দেবত্ব আরোপ তো আমাদের মজ্জাগত। প্রাণের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র থেকে মহাত্মাজী, দেশপ্রাণজী থেকে দেশবন্ধুজী, নেতাজীর অন্তহীন মিছিল। আমার বন্ধু এক ইতিহাসবিদ তাঁর রচিত পাঠ্যপুস্তকে এক দেশনায়কের বিবাহ ও দুর্ঘটনায় সম্ভাব্য মৃত্যু সম্পর্কে যুক্তি নির্ভর কিছু আলোকপাত করলে বিশেষ রাজনৈতিক দলের সদস্যরা তাঁর গৃহে আক্রমণ চালায়। এমন নানা উদাহরণ অসংখ্য।

অতএব আমার আশা শ্রী ভৌমিকের লেখনী স্বাস্থ্যের বৃত্তের পাতায় চলমান থাকবে। স্বাস্থ্যের বৃত্তে চিকিৎসকদের দেবতায়নের বৃত্ত থেকে নিবৃত্ত হবে কিনা এবং চিকিৎসার দুর্বৃত্তায়নকে কিভাবে প্রতিহত করবে তা সম্পাদকদ্বয় ও উপদেষ্টারা আলোচনা করে আমাদের মতো বিভ্রান্ত পাঠকদের ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশ করবেন—এই আশা রাখছি।

—সিদ্ধার্থ গুপ্ত
কলকাতা।

ভ্রম সংশোধন: স্বাস্থ্যের বৃত্তে প্রথম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যায় 'অস্থিমজ্জা পরীক্ষা নিয়ে দু চার কথা' প্রবন্ধটির লেখক পরিচিতিতে ডা. দেবাশিস চক্রবর্তীর ডিগ্রী এম বি বি এস, এম ডি (প্যাথোলজি) হবে, এম বি বি এস, এম ডি, ডি সি পি নয়। এই ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

● স্বাস্থ্যের বৃত্তে: একটি ব্যতিক্রমী প্রয়াস